৯

উনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি থেকে বৃটিশ ভারতে রাজনৈতিক চেতনার উন্মষ পরিলক্ষিত হয়। শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে এই চেতনা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা এই ইউনিটের প্রথম পাঠ হিসেবে স্থান পেয়েছে। ১৯০৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জন্ম হয়। এটা ছিল ভারতীয় রাজনীতিতে সম্প্রদায়ভিত্তিক চিন্তার বহি:প্রকাশ। দ্বিতীয় পাঠে মুসলিম লীগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ এবং খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা রাজনৈতিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা যা এই ইউনিটের তৃতীয় পাঠের বিষয়বস্তু। পরবর্তী চারটি পাঠের মূল বিষয় হচ্ছে শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মতানৈক্য এবং উভয় দল কর্তৃক গ্রহণযোগ্য একটি সাংবিধানিক কাঠামো প্রণয়নে ব্যর্থতা। এর ফলে ভারত বিভক্তি অনিবার্য হয়ে পড়ে। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তানের আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- পাঠ-১. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস
- পাঠ-২. মুসলিম লীগ
- পাঠ-৩. খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন
- পাঠ-৪. নেহেরু রিপোর্ট ও জিন্নাহর ১৪ দফা
- পাঠ-৫. গোলটেবিল বৈঠক
- পাঠ-৬. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন
- পাঠ-৭. সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও ভারতবর্ষের বিভক্তি

পাঠ - ১

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠনের পটভূমি সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *কংগ্রেসর প্রাথমিক লক্ষ্য ও দাবি-দাওয়াসমূহ জানতে পারবেন;*
- *আনুগত্যের নীতি এবং এই নীতির পরিবর্তন সম্পর্কে বলতে পারবেন;*
- *কংগ্রেস-মুসলিম লীগ সম্পর্ক বিষয়ে জানতে পারবেন;*
- *জাতীয়তাবাদের দ্বিধাবিভক্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন।*

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়। ১৮৫০-এর পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক সভা-সমিতি গঠিত হয়। যদিও ঐক্যবদ্ধ সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের জন্ম হতে আরও অনেক দিন বাকি ছিল, তথাপি এসব নতুন নতুন সংগঠনের কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রথম জাতীয়তাবোধের সূচনা হয়। ১৮৫৩ খ্রি. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চার্টার নবায়নের প্রাক্কালে শিক্ষিত ও সচেতন ভারতীয়দের মধ্যে সংগঠন গড়ার প্রবণতা দেখা যায়। এর কারণ ছিল ভারতীয়দের দাবি-দাওয়া কোন সংস্থার মাধ্যমে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করার তাগিদ। অর্থাৎ এই সময়ে ভারতীয়দের মধ্যে রাজনীতি-সচেতনতা এবং দেশাত্মবোধের জন্ম হয়। কাজেই ১৮৮৫ খ্রি. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হওয়ার পটভূমি ছিল পূর্ববর্তী ত্রিশ বছর সময়ে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন স্থানীয় এবং শ্রেণীভিত্তিক সংগঠন ও সেগুলোর কার্যক্রম সূচিত হওয়া।

১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ন্যাশনাল এসোসিয়েশন এবং অক্টোবর মাসে বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয় সংগঠনের সম্পাদক ছিলেন। প্রথমটি সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায় না। কিন্তু দ্বিতীয়টি যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব। ১৮৬৭ খ্রি. তাঁর মৃত্যু পরবর্তী দু'বছর প্রসন্নকুমার ঠাকুর সভাপতির পদে কর্মরত ছিলেন। ১৮৬৯ থেকে ১৮৭৯ খ্রি. পর্যন্ত দ্বারকানাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমানাথ ঠাকুর এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৫২ খ্রি. এই সংগঠন শাসন সংস্কার সম্পর্কিত এক দীর্ঘ আবেদনপত্র বৃটিশ পার্লামেন্টের নিকট প্রেরণ করে। পরবর্তীকালে কংগ্রেস পার্টির অনেক দাবি-দাওয়ার মধ্যে উক্ত আবেদনপত্রের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। শাসনকার্যে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের পথ সুগম করাই ছিল এই আবেদনের প্রধান উদ্দেশ্য।

উনিশ শতকের শেষার্ধে জাতীয়তাবোধ আরো প্রসার লাভ করে। ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার, যোগাযোগ ব্যবস্থার (বিশেষত রেল ও ডাক যোগাযোগ) উন্নয়ন, সংবাদপত্রের মাধ্যমে বৃটিশ শাসনের ভালমন্দ সম্পর্কে আলোচনা ইত্যাদি ছিল এর প্রধান কারণ। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে জাতীয় চেতনা উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত এবং শহুরে শ্রেণীর মধ্যে সীমিত ছিল। আলোচ্য সময়ের সবচেয়ে বিখ্যাত সংগঠন ছিল Indian Association বা ভারতসভা। ১৮৭৬ খ্রি. সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এবং আনন্দমোহন বসু এটি প্রতিষ্ঠা করেন। সুরেন্দ্রনাথ একে "শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক সচেতনতার প্রথম সংঘবদ্ধ রূপ" বলে উল্লেখ করেন। পূর্বোল্লেখিত সংগঠনসমূহের তুলনায় ভারতসভার কর্মসূচি ছিল ব্যাপকতর এবং এটা ছিল আরো

বেশি মানুষের প্রতিনিধিত্বশীল। এর উদ্দেশ্যাবলি ছিল: (১) দেশে জনমত গঠন করা; (২) রাজনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে ঐক্যবদ্ধ করাঃ (৩) হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রীর প্রসার; এবং (৪) রাজনৈতিক আন্দোলনে অশিক্ষিত জনসাধারণের যোগদানের ব্যবস্থা করা। সর্বভারতীয় অসাম্প্রদায়িক জাতীয় চেতনা প্রসারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনের প্রাণপুরুষ ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী।

১৮৭৭ খ্রি. সৈয়দ আমীর আলী ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন।জাতীয়তাবাদী ভাবধারার উন্মেষকাল থেকেই ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবাদ এর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা দেয়।শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, পেশা, চাকরি ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারে মুসলমানদের পশ্চাৎপদতা এবং সর্বভারতীয় পর্যায়ে এই সম্প্রদায়ের সংখ্যালঘিষ্ঠতা এই স্বাতন্ত্র্যবাদের পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল।তবে ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন এবং ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনের মধ্যে কোন প্রকার বৈরী সম্পর্ক ছিল না।১৮৮৩ খ্রি. ইলবার্ট বিল সম্পর্কিত আন্দোলনে এই দুই সংগঠন পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে অংশগ্রহণ করে।

এভাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পটভূমি তৈরি হয়। রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা এবং ভূমিকা সম্পর্কে মানুষ ধীরে ধীরে অবহিত হয়, যার পেছনে উল্লেখিত সংগঠনসমূহের বিরাট অবদান ছিল।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠনের উদ্যোক্তা ছিলেন স্কটল্যান্ডের অধিবাসী অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম (Allan Octavian Hume)। ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি সিমলায় বসবাস করতে থাকেন। একটা রাজনেতিক দল গঠনের পরিকল্পনার পশ্চাতে সক্রিয় ছিল ভারতের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম মমত্ববোধ। সে সঙ্গে ছিল বৃটিশ শাসনের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার চিন্তা। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের মত আর কোন রক্তক্ষয়ী ঘটনা যেন সংঘটিত না হয় সেটাও তাঁর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি শাসক ও শাসিতের যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করেন। একটা সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন ছাড়া এই যোগাযোগ সম্ভবপর ছিল না। তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ জাতীয় সংগঠন স্থাপনের জন্যে হিউম-এর মতো একজন ব্যক্তির দরকার ছিল। পরবর্তী সময়ের প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা গোপাল কৃষ্ণ গোখলে বলেন, রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া, বিক্ষোভ ইত্যাদি কারণে সে সময় সরকারি মহলে ভারতীয়দের প্রতি যে সন্দেহ বিরাজ করছিল তাতে কোন ভারতবাসীর পক্ষে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগ নেওয়া অসম্ভব ছিল। শুধুমাত্র একজন মহান ইংরেজ (আসলে স্কট) এবং প্রাক্তন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে হিউম একাজে ব্রতী হতে পেরেছিলেন।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ চারদিন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতি ছিলেন প্রখ্যাত বাঙালি ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়– যিনি W.C. Bonnerji নামে অধিক পরিচিত ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে আগত বাহাত্তর জন প্রতিনিধিসহ প্রায় শতাধিক লোক এই অধিবেশনে যোগদান করেন। তবে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রধান পুরুষ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এই সভায় উপস্থিত ছিলেন না। ঠিক একই সময়ে তিনি কলিকাতায় জাতীয় সম্মেলনের (National Conference) অধিবেশন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তবে কংগ্রেসের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সুরেন্দ্রনাথ যোগদান করেন এবং পরবর্তী সময়ে এই সংগঠনের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হন। সেই সঙ্গে তাঁর উদ্যোগে গঠিত জাতীয় সম্মেলনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়।

হিউম আশা করেছিলেন যে, কংগ্রেস হবে সামাজিক ও রাজনৈতিক ইস্যুভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু পরে সামাজিক প্রশ্নে এই সংগঠনকে না জড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কারণ, তাতে মতানৈক্যের সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল। প্রথম অধিবেশনে যেসব প্রস্তাব গৃহীত হয় সেগুলো ছিল–

(১) বৃটিশ ভারতীয় সরকারের কার্যাবলি তদন্তের জন্যে একটি রাজকীয় (Royal) কমিশন গঠন;

(২) ভারত সচিবের পরিষদ বিলুপ্ত করা;

(৩) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদসমূহের সংস্কার এবং নির্বাচনের মাধ্যমে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা;

(৪) সিভিল সার্ভিসের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা একই সঙ্গে ইংল্যান্ড এবং ভারতে নেওয়ার ব্যবস্থা করা এবং পরীক্ষার্থীর বয়স অনধিক ২৩ বছর নির্ধারণ করা। অন্যান্য সরকারি চাকরিতে নিয়োগের জন্যে ভারতে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা;

(৫) সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি অনাবশ্যক এবং এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন না করা।

উক্ত দাবিগুলোতে ভারতের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। একই সঙ্গে বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যহীনতার কোন ইঙ্গিত এই প্রস্তাবসমূহে পাওয়া যায় না।

কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এবার প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ৪৩৪। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় দাদাভাই নওরোজী। তিনি অকুণ্ঠচিত্তে বৃটিশ সরকারের প্রতি ভারতবাসীদের আনুগত্য ঘোষণা করেন। তাঁর ভাষণে তিনি প্রশ্ন করেন, "এই কংগ্রেস কি বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের আস্তানা?" (সভাস্থলে 'না' 'না' ধ্বনি শোনা যায়) "নাকি এই কংগ্রেস সরকারের স্থিতিশীলতার ভিত্তিমূলে আর একটি প্রস্তরখন্ড?" (সভাস্থলে 'হ্যাঁ' 'হ্যাঁ' ধ্বনি শোনা যায়।) প্রকৃতপক্ষে, বৃটিশরাজের প্রতি আনুগত্য ছিল কংগ্রেসের প্রথম বিশ বছরের মূলনীতি। অনেক বৃটিশ পর্যবেক্ষক দাদাভাই-এর ভাষণকে শুধুমাত্র মুখের বুলি বলে অগ্রাহ্য করলেও কংগ্রেসের এ সময়কার প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ (উমেশচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, দাদাভাই নওরোজী এবং ফিরোজ শাহ মেহতা প্রমুখ) এবং তাঁদের অনুসারীগণ ভিক্টোরীয় যুগের উদারনীতির আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং এই আদর্শের জন্মভূমি বৃটেনের প্রতি তাঁদের আনুগত্যে কোন ভেজাল ছিল বলে মনে হয় না।

প্রথম থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রধানতম দুর্বলতা ছিল মুসলমান সম্প্রদায়কে দলে টানার অক্ষমতা। যে স্বল্পসংখ্যক মুসলমান প্রাথমিক পর্যায়ে এই সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাঁরা সবাই পশ্চিম ভারতের (বিশেষত বোম্বাইয়ের) ব্যবসায়ী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নিজেদের আর্থিক-সামাজিক অবস্থানকে তাঁরা হিন্দুদের তুলনায় হীন ভাবতেন না বলেই কংগ্রেসের রাজনীতিতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের তৃতীয় কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি বদরুদ্দীন তায়েবজী এই শ্রেণীর মুসলমানের প্রতিনিধি ছিলেন। এ ব্যাপারে মুসলমান সম্প্রদায় স্যার সৈয়দ আহমদ খানের মতানুসারী ছিল বলে মনে হয়। স্যার সৈয়দ স্বীয় সম্প্রদায়কে কংগ্রেস থেকে দূরে থাকার উপদেশ দেন। তিনি মনে করতেন ঐ সময়ে রাজনীতি নিয়ে অধিক মাতামাতি মুসলমানদের ক্ষতির কারণ হবে। তাঁর ধারণা ছিল ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা ভারতে আমদানি করা অসম্ভব। কারণ, এখানে ব্যক্তি বা দল নয়, সম্প্রদায়ই নির্বাচনে একমাত্র বিবেচ্য বিষয়ে পরিণত হবে।

১৯০৫ খ্রি. বড়লাট কার্জন কর্তৃক বঙ্গবিভাগকে কেন্দ্র করে। বৃটিশ সরকারের প্রতি কংগ্রেসের আনুগত্যে প্রথমবারের মত ফাটল ধরে। এর ফলে কংগ্রেস নেতৃত্বে চরমপন্থীদের আবির্ভাব ঘটে। তবে একই সময়ে ইংল্যান্ডে উদারনৈতিকদের (Liberals) ক্ষমতায় আসার কারণে কংগ্রেসী আনুগত্যবাদীগণ কিঞ্চিৎ আশান্বিত হন এই ভেবে যে উদারপন্থী সরকারের নীতি তাঁদের হাতকে শক্তিশালী করবে। কিন্তু অচিরেই তাঁরা হতাশ হন; নতুন ভারত সচিব জন মর্লি ঘোষণা করেন যে, বঙ্গবিভাগ একটা প্রতিষ্ঠিত ঘটনা এবং এই সিদ্ধান্ত রদ করা হবে না।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে উপদলীয় কোন্দলের আশঙ্কা আরো বেড়ে যায়। নরমপন্থীরা সংঘর্ষ এড়ানোর জন্যে পুনর্বার দাদাভাই নওরোজীকে সভাপতি মনোনীত করেন। তিনি চরমপন্থীদেরকে খুশি করার জন্যে এবং সম্ভাব্য সংঘাত থেকে দলকে রক্ষা করার জন্য স্বরাজের পক্ষে দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু এতেও উপদলীয় কোন্দল প্রশমিত হয়নি। দলের পরবর্তী (ডিসেম্বর, ১৯০৭) সম্মেলন সুরাটে অনুষ্ঠিত হয়। সুরাট ছিল পার্সী সম্প্রদায়ভুক্ত উদারপন্থী নেতা ফিরোজ শাহ মেহতার আবাসস্থল। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ১৬০০ প্রতিনিধি। সভাপতি হিসেবে ডঃ রাসবিহারী ঘোষের

নাম প্রস্তাবিত হওয়ার সাথে সাথে গোলযোগ শুরু হয়। চরমপন্থীদের নিক্ষিপ্ত জুতা সুরেন্দ্রনাথ এবং ফিরোজশাহ মেহতাকে আঘাত করে। এভাবেই সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে। কংগ্রেসের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ১৯১১ খ্রি. বঙ্গবিভাগ রদ হওয়ার পর প্রশমিত হয়।

অতপর ১৯১৪ খ্রি. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে বৃটেন মিত্রপক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বৃটিশরাজের প্রতি যুদ্ধকালীন সময়ে আনুগত্যের নীতি গ্রহণ করে। একই সঙ্গে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সঙ্গে কংগ্রেস একটি সমঝোতায় উপনীত হয়। এই সমঝোতা লখ্‌নৌ চুক্তি (১৯১৬) নামে খ্যাত।

যুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলোতে কংগ্রেসের নীতি, কর্মপদ্ধতি এবং লক্ষ্যের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। যুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক পরিস্থিতি এর জন্য দায়ী। একই সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণও এর অন্যতম প্রধান কারণ। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই দল ছিল শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংগঠন। যুদ্ধোত্তর সময়ে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষও কংগ্রেসের নেতৃত্বে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ শুরু করে। ধীরে ধীরে এই দল একটি গণ-সংগঠনের (mass party) রূপ নেয়।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের লাহোর অধিবেশনে 'পূর্ণস্বরাজ' বা স্বাধীনতা কংগ্রেসের লক্ষ্য হিসেবে স্থিরীকৃত হয়। তবে মুসলিম লীগের উত্থান এবং ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের ফলে অখন্ড ভারতের স্বাধীনতার সম্ভাবনা দ্রুত নস্যাৎ হয়ে যায়। ১৯৩০ এবং ১৯৪০-এর দশকে রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগের স্বতন্ত্র আবাসভূমি তথা পাকিস্তানের দাবি মেনে নেওয়া ছাড়া কংগ্রেস ও বৃটিশ সরকারের নিকট কোন বিকল্প ছিল না। সব আপোষ-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ফলে ১৯৪৭ খ্রি. আগস্ট মাসের মাঝামাঝিতে ভারত ও পাকিস্তান নামক দু'টি স্বতন্ত্র দেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

সারসংক্ষেপ

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন সভা-সমিতি ও সংগঠনের মাধ্যমে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীসমূহ নিজেদের দাবি-দাওয়া এবং মতামত প্রকাশ করতে শুরু করে। সংবাদপত্রের প্রসার এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে সর্বভারতীয় ধ্যান-ধারণা প্রচারে সুবিধা হয়। এই প্রেক্ষাপটে ১৮৮৫ খ্রি. অবসরপ্রাপ্ত বৃটিশ সিভিলিয়ান অ্যালনে অক্টাভিয়ান হিউমের উদ্যোগ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম বৈঠক বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের নীতি অনুসরণ করলেও ধীরে ধীরে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে এই দল ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পুরোভাগে এসে যায়। তা সত্ত্বেও মুসলিম সম্প্রদায়ের পূর্ণ আস্থা অর্জনে এই দল ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত দ্বিধাবিভক্ত জাতীয়তাবাদী ভাবধারার ফলে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে ভারত ও পাকিস্তান নামক দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস (আধুনিক যুগ)*, কলিকাতা, ১৯৯৮।
২. S.M. Burke and Salim Al-Din Quraishi, *The British Raj in India: An Historical Review,* Dhaka, 1995.
৩. Sumit Sarkar, *Modern India, 1885-1947, Delhi*, 1983.
৪. Hugh Tinker, *South Asia: A Short History.*, London1966.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন গঠিত হয় কোন খ্রিস্টাব্দে?
(ক) ১৮৩৮ (খ) ১৮৫১
(গ) ১৮৫৯ (ঘ) ১৯৫৯।

২। ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন–
(ক) প্রসন্নকুমার ঠাকুর (খ) রাধাকান্ত দেব
(গ) সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী (ঘ) কোনটিই নয়।

৩। জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রথম উন্মেষ ঘটে কোন শ্রেণীর মধ্যে?
(ক) মধ্যবিত্ত শ্রেণী (খ) জমিদার শ্রেণী
(গ) কৃষক শ্রেণী (ঘ) উচ্চবিত্ত শ্রেণী।

৪। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন–
(ক) উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (খ) আনন্দমোহন বসু
(গ) অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম (ঘ) কোনটিই নয়।

৫। কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজ দাবি করে কোন খ্রিস্টাব্দে?
(ক) ১৯০৫ (খ) ১৯২৯
(গ) ১৯৩৫ (ঘ) ১৯৪০।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ কখন এবং কিভাবে সাধিত হয়?
২। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রাথমিক লক্ষ্যসমূহ কি ছিল?
৩। ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠায় কংগ্রেস ব্যর্থ হয় কেন?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পটভূমি বর্ণনা করুন।
২। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে কংগ্রেসের ভূমিকার মূল্যায়ন করুন।

পাঠ - ২

মুসলিম লীগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ জানতে পারবেন;*
- *কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের সম্পর্ক জানতে পারবেন;*
- *পাকিস্তান আন্দোলন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে জানতে পারবেন।*

মুসলিম লীগ

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় মুসলমানদের অবিসংবাদিত নেতা স্যার সৈয়দ আহমদ খানের মৃত্যুর ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে নেতৃত্বের শূন্যতা দেখা দেয়। এর বেশ কয়েক বছর পর রাজনৈতিক অঙ্গনে এমন কিছু ঘটনার সূত্রপাত হয় যা বিরাজমান সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যবোধকে আরো বেশি শক্তিশালী উপাদানে পরিণত করে। লর্ড কার্জন কর্তৃক ১৯০৫ খ্রি. সম্পাদিত বঙ্গবিভাগকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিরোধ জোরদার হয়। বঙ্গবিভাগ বিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল কলিকাতাকেন্দ্রিক শিক্ষিত হিন্দু পেশাজীবী শ্রেণী। নতুন সৃষ্ট প্রদেশ 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল বিধায় বঙ্গবিভাগের ফলে মুসলমানগণ লাভবান হবে এই ছিল সাধারণ ধারণা। ফলে অল্প সংখ্যক শিক্ষিত মুসলমান ব্যতীত বাংলার বেশির ভাগ মুসলমান বঙ্গ বিভাগের পক্ষে ছিল। বঙ্গবিভাগের পক্ষে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহ। বঙ্গবিভাগ প্রসূত বিক্ষোভ, আন্দোলন, লেখালেখি, বক্তৃতা-বিবৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার সৃষ্টি হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমান নেতৃবৃন্দ একটি রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন অনুভব করেন। এ-ই ছিল মুসলিম লীগ নামক রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট।

এ সময়ের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। ঘটনাটি ছিল ১৯০৬ খ্রি. বৃটেনে উদারপন্থীগণ (Liberals) কর্তৃক সরকার গঠন এবং নতুন সরকারের ঘোষিত ভারত-নীতি। ঐ বছরের ২০শে জুলাই ভারত সচিব জন মর্লি ভারতবর্ষে প্রতিনিধিত্বশীল শাসন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় শাসন সংস্কারের ইঙ্গিত দেন। এতে ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থ কতটুকু সংরক্ষিত হবে সেই ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়, যা মুসলিম নেতৃবৃন্দের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১ অক্টোবর পঁয়ত্রিশ জনের একটি দল আগা খানের নেতৃত্বে সিমলায় ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। এটি ছিল বিখ্যাত সিমলা ডেপুটেশন। মুসলিম নেতৃবৃন্দের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে লর্ড মিন্টো তাঁদেরকে এই মর্মে আশ্বস্ত করেন যে, ভবিষ্যতের যে কোন শাসনতান্ত্রিক সংস্কারে মুসলিম স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে সরকার সচেতন থাকবে। তিনি মুসলিম নেতৃবৃন্দের পেশকৃত পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিও সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার আশ্বাস দেন।

সিমলায় সমবেত নেতারা বুঝতে পারলেন যে, শুধু একবার বড়লাটের নিকট দাবি পেশ করাই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন একটি স্থায়ী রাজনৈতিক সংগঠনের যার মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার জন্যে সবসময় চেষ্টা চালানো সম্ভব। সিমলাতে প্রাথমিকভাবে স্থির করা হয় যে, কয়েক মাস পর ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের (Mohammedan Educational Conference) সভায় একটি রাজনৈতিক দল গঠনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। সেই অনুসারে শিক্ষা সম্মেলন শেষ হওয়ার পর ৩০ ডিসেম্বর নওয়াব ভিকারুল মুলকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে নওয়াব সলিমুল্লাহ কর্তৃক পেশকৃত নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয় ঃ

নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্যে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ নামক একটি রাজনৈতিক সংস্থা গঠিত হোক–

(ক) বৃটিশ সরকারের প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের আনুগত্য বৃদ্ধি করা এবং কোন সরকারি নীতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুসলমানদের ভুল ধারণার অবসান করা;

(খ) ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা, উন্নয়ন সাধন এবং তাদের প্রয়োজন ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা সরকারের নিকট সসম্মানে পেশ করা;

(গ) মুসলমানদের মধ্যে যাতে অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বৈরী মনোভাব জাগ্রত না হয় সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অবশ্য এই নীতির সঙ্গে লীগের অন্যান্য লক্ষ্যসমূহের যাতে কোন সংঘাত না হয় সেই ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

উক্ত সম্মেলনে বঙ্গবিভাগকে স্বাগত জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং বঙ্গবিভাগ বিরোধী আন্দোলনকে নিন্দা ও নিরুৎসাহিত করার জন্যে সরকারের নিকট আবেদন জানানো হয়।

মুসলিম লীগের প্রথম অধিবেশন (Session) দুই পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত হয় ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে করাচিতে এবং দ্বিতীয় পর্ব পরবর্তী বছরের মার্চ মাসে আলীগড়ে। আলীগড় সম্মেলনে আগা খানকে মুসলিম লীগের স্থায়ী সভাপতি পদে নির্বাচিত করা হয়। একই বছরের মে মাসে সৈয়দ আমীর আলীর সভাপতিত্বে লীগের লন্ডন শাখা খোলা হয়। আগা খান ১৯১৩ খ্রি. পর্যন্ত লীগের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯০৯ খ্রি. বৃটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত। ঐ বছর মর্লি মিন্টো সংস্কার আইনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহের সদস্যসংখ্যা বর্ধিত করা হয়। মুসলিম লীগের জন্যে সন্তুষ্টির কারণ ছিল এই সংস্কারের মাধ্যমে স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থার স্বীকৃতিদান এবং মুসলমানদের জন্যে আসন সংরক্ষণ। উভয়বিধ নীতি বৃটিশ ভারতীয় শাসনতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে।

মর্লি-মিন্টো সংস্কার পরবর্তী সময়ে মুসলিম লীগের রাজনীতিতে একটা স্বাভাবিক আত্মতুষ্টি ও উদারতার ভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৯১০ খ্রি. জানুয়ারিতে লীগের দিল্লি অধিবেশনে মহামান্য আগা খান এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা (যা মুসলমানদের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজন) গ্রহণের ফলে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে "স্থায়ী রাজনৈতিক সহানুভূতি এবং অকৃত্রিম কার্যকরী সম্পর্ক" গড়ে উঠবে। ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে লীগের চতুর্থ বার্ষিক সভার সভাপতি সৈয়দ নবী উল্লাহ উক্ত বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে বলেন যে, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে আন্তরিক সহযোগিতার সৃষ্টি করে তাদের অভিন্ন স্বদেশভূমির গৌরববৃদ্ধি ও উন্নয়নের পথ সুগম করবে।

পরের বছর অর্থাৎ ১৯১১ খ্রি. বঙ্গবিভাগ রদের ফলে মুসলিম লীগের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়। পরিবর্তিত ব্যবস্থায় "পূর্ববঙ্গ ও আসাম" প্রদেশ বিলুপ্ত হয়। পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চল নিয়ে গভর্নর শাসিত বাংলা প্রদেশ গঠিত হয়। বিহার ও উড়িষ্যা লেফটেন্যান্ট গভর্নর শাসিত পৃথক প্রদেশে পরিণত হয়। আসাম বঙ্গবিভাগ-পূর্ব অবস্থায় অর্থাৎ চীফ কমিশনারের শাসনাধীনে প্রত্যাবর্তন করে। সরকারের এই সিদ্ধান্তে মুসলিম লীগ অসন্তুষ্ট হলেও কংগ্রেস দলের প্রতি এবং সার্বিকভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি বন্ধুত্বের নীতি অব্যাহত থাকে। কংগ্রেসী নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে লীগও ভারতের স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থান করে। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বাঁকিপুরে লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে এইমর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, মুসলিম লীগের লক্ষ্য হচ্ছে ভারতের জন্যে যথাযথ বা প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন অর্জন করা।

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে মুসলিম লীগের জন্যে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। বোম্বাইয়ের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ লীগের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। অবশ্য একই সঙ্গে তিনি কংগ্রেসের সদস্য হিসেবেও থাকেন। তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে একই সাথে এই দুই দলের সদস্য হওয়া কোন অভাবনীয় ব্যাপার ছিল না। জিন্নাহ এই শর্তে লীগে যোগদান করেন যে, লীগ বা মুসলিম স্বার্থের প্রতি তাঁর সমর্থন কোনভাবে বা কোন সময়ে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের ওপর কোন ছায়াপাত ঘটাবে না, জাতীয় স্বার্থের জন্যেই তাঁর জীবন উৎসর্গিত হবে। এই অবস্থায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদে অবিচল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সত্যিকার অর্থে "হিন্দু-মুসলিম মিলনের দূত" হিসেবে কাজ করার অপূর্ব সুযোগ লাভ করেন।

অতপর ১৯১৪ খ্রি. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস উভয় দল বৃটেনের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে। লক্ষ লক্ষ ভারতীয় বৃটেনের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করে এবং ইউরোপ, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের রণক্ষেত্রগুলোতে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এমতাবস্থায় ১৯১৬ খ্রি. কংগ্রেস ও লীগের মধ্যেও একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা 'লখ্‌নৌ চুক্তি' নামে খ্যাত। এই চুক্তির মাধ্যমে কংগ্রেস প্রকারান্তরে মুসলিম লীগকে ভারতের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী দল হিসেবে স্বীকার করে নেয়। চুক্তির প্রধান শর্তাবলী ছিল–

(১) কংগ্রেস মুসলমানদের জন্যে পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা স্বীকার করে নেয়। যেসব প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যালঘিষ্ঠ সেখানে তাদের জন্যে সংখ্যানুপাতের অতিরিক্ত প্রতিনিধিত্বের দাবি (weightage) মেনে নেয়।

(২) মুসলিম লীগ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে (বাংলা ও পাঞ্জাব) সংখ্যানুপাতের কম মুসলিম প্রতিনিধিত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হয়।

যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে বৃটেনের প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের আনুগত্যে কিছু জটিলতা দেখা দেয়। যুদ্ধে জার্মানির পক্ষাবলম্বনকারী তুরস্কের নিশ্চিত পরাজয়ের সম্ভাবনা এই জটিলতার কারণ ছিল। যুদ্ধোত্তর সময়ে পরাজিত তুরস্কের ভাগ্য এবং তুর্কি সুলতানের মর্যাদার প্রশ্নে ভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হন। কারণ, তুরস্কের সুলতানকে মুসলিম বিশ্বের খলিফার মর্যাদা দেওয়া হতো। তবে যুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত কংগ্রেস ও লীগ উভয় দলই বৃটেনের প্রতি অনুগত থাকে এবং সেই সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার নীতিও অক্ষুন্ন রাখে। যুদ্ধের পর খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে ধীরে ধীরে সামগ্রিক অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়। কংগ্রেসের নেতৃত্বে আসীন হন মহাত্মা গান্ধী এবং মুসলিম লীগের নেতৃত্বে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্। সেই সাথে জিন্নাহ্‌র সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্কেও ফাটল ধরে এবং ১৯২০-এর দশকের প্রথম দিকে পুরোপুরি ছিন্ন হয়ে যায়। দুই নেতার চিন্তাধারা, নীতি এবং কর্মপদ্ধতি ছিল ভিন্ন এবং ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয় তাঁদের কার্যকলাপ। একই সময়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যকার সম্পর্কও খারাপ হতে থাকে। বিশেষত ১৯২২ খ্রি. প্রথম দিকে গান্ধী কর্তৃক অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত ঘোষিত হওয়ার পর হিন্দু-

মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তী বেশ কয়েক বছর ভারতের বিভিন্ন শহরে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সংঘটিত হয়। ফলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে দূরত্ব আরো বেড়ে যায়।

১৯২৮ খ্রি. ভারতের জন্যে একটা গ্রহণযোগ্য শাসনতান্ত্রিক কাঠামো প্রণয়নের জন্য কংগ্রেস নেতা মতিলাল নেহেরুকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের যথাযথ সুপারিশ ছিলনা বিধায় নেহরু কমিটির রিপোর্ট মুসলিম লীগের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি। অতপর ১৯৩০ এবং ১৯৪০-এর দশকে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ, কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে অনেক ত্রিপক্ষীয় আলাপ-আলোচনা ও বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু মতানৈক্য থেকেই যায়। ইতোমধ্যে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে স্বতন্ত্র মুসলিম আবাসভূমির (Seperate states) প্রস্তাব নেওয়া হয়। এই প্রস্তাব 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামেও পরিচিত, এর মূলকথা ছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্বে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহে মুসলিম রাষ্ট্র গঠন। এই দাবির ভিত্তি ছিল দ্বিজাতিতত্ত্ব অর্থাৎ ভারতের হিন্দু ও মুসলমান দু'টি জাতি এবং তাদের জন্যে পৃথক পৃথক রাষ্ট্রের প্রয়োজন। অখন্ড ভারতের সপক্ষে কোন সর্বসম্মত ফর্মুলার অভাবে শেষ পর্যন্ত স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি ভারতীয় মুসলমানদের নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়।লাহোর প্রস্তাবের পরবর্তী বছরগুলোতে জিন্নাহ'র নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার উত্থান ঘটে। এরই ফলে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসের মাঝামাঝিতে বৃটিশ ভারত দ্বিখন্ডিত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হয়।

সারসংক্ষেপ

১৯০৬ খ্রি. ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ নামক রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তার ফল। ভারতীয় কংগ্রেস মুসলিম সম্প্রদায়ের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়। প্রধানত মুসলিম স্বার্থরক্ষার নামে ভারতের নেতৃস্থানীয় মুসলমানগণ মুসলিম লীগের গোড়াপত্তন করেন। কংগ্রেসের মত মুসলিম লীগেরও প্রাথমিক পর্যায়ের নীতি ছিল বৃটিশ শাসনের প্রতি অকৃত্রিম আনুগত্য প্রদর্শন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় লীগ ও কংগ্রেস পারস্পরিক সৌহার্দ্যের নীতি অনুসরণ করে। ১৯১৬ খ্রি. স্বাক্ষরিত লখনৌ চুক্তি এই নীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পরবর্তী সময়ে জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে লীগ মুসলিম স্বার্থ রক্ষায় মনোনিবেশ করে এবং মুসলমানদের একমাত্র প্রনিতিধিত্বকারী সংগঠনের মর্যাদা দাবি করে। এতে কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। ১৯৪০-এর মার্চ মাসে লীগের 'লাহোর প্রস্তাব' তথা মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র বাসভূমির (Seperate states) দাবির ফলে এই সংঘাত চূড়ান্তরূপ নেয়। এই স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতি শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান নামক পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে পরিণতি লাভ করে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

1. S.M. Burke and Salim Al-Din Quraishi, *The British Raj in India: An Historical Review*, Dhaka, 1995.
2. Sumit Sarkar, *Modern India,* Delhi, *1885-19477*, 1983.
3. Hugh Tinker, *South Asia: A Short History*, London, 1966.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সিমলা ডেপুটেশনের নেতৃত্ব দেন–
(ক) আগা খান (খ) মহসীন-উল-মূলক
(গ) সলিমুল্লাহ (ঘ) কেউই নন।

২। মুসলিম লীগ বঙ্গ বিভাগকে–
(ক) স্বাগত জানায় (খ) সমালোচনা করে
(গ) এই ব্যাপারে নিরপেক্ষ ছিল (ঘ) কোনটিই নয়।

৩। বঙ্গ বিভাগের ফলে সৃষ্ট নতুন প্রদেশের নাম ছিল–
(ক) পূর্ব বাংলা (খ) পূর্ব পাকিস্তান
(গ) পূর্ব বঙ্গ ও আসাম (ঘ) পশ্চিম পাকিস্তান।

৪। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগে যোগ দেন–
(ক) ১৯০৬ খ্রি. (খ) ১৯১৩ খ্রি.
(গ) ১৯২০ খ্রি. (ঘ) ১৯৩০ খ্রি.।

৫। নেহরু রিপোর্টে মুসলিম লীগের দাবিসমূহ–
(ক) সম্পূর্ণ মেনে নেওয়া হয় (খ) সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হয়
(গ) কিছু কিছু মেনে নেওয়া হয় (ঘ) মেনে নেওয়া হয় না।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। সিমলা ডেপুটেশন বলতে কি বুঝায়? এর দাবি দাওয়া কি ছিল?
২। মুসলিম লীগের প্রাথমিক উদ্দেশ্যসমূহের বিবরণ দিন।
৩। মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইনের (১৯০৯ খ্রি.) মূলকথা কি ছিল?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি আলোচনা করুন।
২। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় মুসলিম লীগের ভূমিকা পর্যালোচনা করুন।

পাঠ - ৩

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *খিলাফত সম্পর্কে জানবেন;*
- *খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এক সঙ্গে পরিচালিত হওয়ার পেছনে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *আন্দোলনের ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারবেন।*

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানির পক্ষাবলম্বন করে। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এটা নিশ্চিতভাবে প্রতীয়মান হয় যে, জার্মানির ও তার মিত্রদের পরাজয় কেবল সময়ের ব্যাপার। তুরস্কের এই অবশ্যম্ভাবী পরাজয় ভারতীয় মুসলমানদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেক্ষেত্রে তাদের সম্মুখে দেখা দেয় উভয় সংকট; বৃটেনের যুদ্ধ প্রচেষ্টার সমর্থন এবং মুসলিম বিশ্বের খলিফা হিসেবে বিবেচিত তুর্কি সুলতানের প্রতি ধর্মীয় আনুগত্য। ভারতীয় মুসলমানদেরকে আশ্বস্ত করার জন্যে যুদ্ধকালীন সময়ে বৃটিশ সরকার ঘোষণা করে যে, তুরস্কের ধ্বংস সাধন করা বৃটেনের উদ্দেশ্য নয়; তুর্কি জাতি অধ্যুষিত তুরস্কের মূল ভূখন্ডের ঐক্য ও স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখা হবে। কিন্তু ভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ এতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাঁদের ইচ্ছা ছিল যুদ্ধের পর আরব ভূ-খন্ড সহ সমস্ত উসমানীয় সাম্রাজ্য যাতে টিকে থাকে; কারণ একমাত্র সেই পরিস্থিতিতে তুর্কি সুলতান মুসলিম বিশ্বের খলিফা ও পবিত্র স্থানসমূহের তত্ত্বাবধায়করূপে স্বীয় মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হবেন।

তবে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরপরই একথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, অন্যান্য পরাজিত শক্তির মত তুরস্কের ওপরও একটা কঠোর শান্তিচুক্তি চাপিয়ে দেওয়া প্রায় অনিবার্য। এধরনের সম্ভাবনা থেকে তুরস্ককে রক্ষা করা এবং সুলতানের পদমর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে যুদ্ধোত্তর সময়ে ভারতে খিলাফত আন্দোলন শুরু হয়। চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে বৃটেনকে পরাজিত তুরস্কের প্রতি উদারতা প্রদর্শনে বাধ্য করাই ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য। মুসলমান সম্প্রদায়ের বৃটিশ বিরোধী মনোভাব কাজে লাগিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহাত্মা গান্ধী খিলাফতের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। তিনি তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফত আন্দোলনকে একই ধারায় প্রবাহিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধের অব্যবহিত পরপরই সারা ভারতে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং খুব দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে ভারতের কতিপয় মুসলিম নেতা কর্তৃক খিলাফত কনফারেন্স নামক একটি সংগঠন স্থাপিত হয়। সেই বছরের ২৩ এবং ২৪ নভেম্বর দিল্লিতে এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন মহাত্মা গান্ধী। তাঁর উপদেশ অনুযায়ী সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, তুরস্কের ব্যাপারে ভারতীয় মুসলমানদের দাবি অনুসারে যদি ব্যবহার করা না হয় তবে বৃটিশ ভারতীয় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করা হবে না। ডিসেম্বর মাসের শেষ নাগাদ চারটি সংগঠন অমৃতসরে নিজ নিজ

অধিবেশনে মিলিত হয়। এই সংগঠনগুলো ছিল কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, খিলাফত কনফারেন্স এবং নবগঠিত জমিয়ত-ই-উলামা-ই-হিন্দ। কংগ্রেস-লীগ সহযোগিতার যে ধারা লখ্‌নৌ চুক্তির (১৯১৬ খ্রি.) মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অমৃতসরেও তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন হাকিম আজমল খান যিনি ছিলেন কংগ্রেসের একজন প্রথম সারির নেতা। অপরদিকে কংগ্রেস সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের মাধ্যমে বৃটিশ সরকারকে অনুরোধ জানানো হয় যাতে ভারতীয় মুসলমানদের মতানুসারে তুর্কি সমস্যার সমাধান করা হয়। লীগের উদ্বোধনী সভায় গান্ধী, মতিলাল নেহরু, মদনমোহন মালব্য প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন। মুসলিম লীগের অধিবেশনে খিলাফতের ব্যাপারে বৃটিশ মনোভাবের প্রতি গভীর হতাশা ব্যক্ত করা হয় এবং নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের অঙ্গীকার করা হয়। লীগ সেই বছরের কোরবানীর ঈদে গরুর পরিবর্তে যথাসম্ভব অন্যান্য পশু জবাই করার জন্যে মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানায়। এভাবে খিলাফতকে কেন্দ্র করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ভিত্তি রচনায় রাজনৈতিক দলসমূহ সচেষ্ট হয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ঐ বছরের (১৯১৯ খ্রি.) এপ্রিল মাসে সংঘটিত জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং অপরাধীদের শাস্তি দাবি করে। এই সমস্ত কর্মকান্ডে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি সক্রিয়। পরবর্তী সময়ে গান্ধী বলেছিলেন যে, খিলাফত এমন এক সুযোগ করে দেয় যা আর একশত বছরেও আসবে না; সেটা হচ্ছে এই প্রমাণ করা যে মুসলমান হিন্দুর ভাই। তিনি আরো বলেন যে, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথা একটা শূন্যগর্ভ বক্তব্য থেকে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ড় হিন্দুরা মুসলমানের স্বার্থ বিপন্ন হতে দেখেও দূরে সরে থাকবে।

১৯ জানুয়ারি (১৯২০) পঁয়ত্রিশ জনের একটি খিলাফত প্রতিনিধিদল ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। ডাঃ এম.এ. আনসারী ছিলেন দলের নেতা। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন মহাত্মা গান্ধী, মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী, আবুল কালাম আযাদ, ডঃ সাইফুদ্দীন কিচলু এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। স্বভাবতই ভাইসরয়ের পক্ষে তুরস্কের ব্যাপারে কোন আশার বাণী শোনানো সম্ভব ছিল না। ফেব্রুয়ারি মাসে মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ইউরোপ যাত্রা করে। ১৭ মার্চ এই দল বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড লয়েড জর্জের সঙ্গে সাক্ষাত করে। লয়েড জর্জ প্রতিনিধিদলকে বলেন যে, তুরস্কের সঙ্গে অন্যান্য পরাজিত খ্রিস্টান দেশসমূহের চাইতে ভিন্ন রকম ব্যবহার অসম্ভব। অর্থাৎ সোজা কথায় যুদ্ধে পরাজয়ের মাশুল অন্যান্যদের মত তুর্কি সুলতানকেও দিতে হবে। মোহাম্মদ আলী ও তাঁর দলের ইউরোপ অবস্থানকালীন সময়েই সেভ্‌রে চুক্তির (Treaty of Sevres) শর্তাবলী প্রকাশিত হয় (১৫ মে, ১৯২০ খ্রি.)। এই চুক্তির মূলকথা ছিল তুর্কি সাম্রাজ্য ভেঙ্গে দেওয়া হবে এবং আরবদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তুতি হিসেবে ম্যান্ডেট শাসনাধীনে রাখা হবে। স্মারণা (Smyrna) এবং থ্রেস (Thrace) গ্রিসকে দেওয়া হয়, কন্‌স্টান্টিনোপল তুরস্কের অধীনে রাখা হয়। মোহাম্মদ আলী তুর্কি সুলতানের নিকট প্রেরিত এক আবেদনের মাধ্যমে অনুরোধ করেন যাতে সুলতান উপর্যুক্ত শর্তসমূহ গ্রহণ না করেন।

জুন (১৯২০) মাসের ১, ২ এবং ৩ তারিখে এলাহাবাদে কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির উদ্যোগে সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেভ্‌রে চুক্তির মোকাবেলায় কি করা যেতে পারে তা নির্ধারণ করা ছিল এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। ২ জুন একটা অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্যে একটি সাব-কমিটি গঠিত হয়- যার সদস্য ছিলেন গান্ধী এবং ছয় জন মুসলিম নেতা।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে খিলাফত আন্দোলনের এক করুণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয়। প্রায় ১৮,০০০ মুসলমান– যাদের বেশির ভাগ ছিল সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী– বৃটিশ ভারত ত্যাগ করে মুসলিম দেশ আফগানিস্তানে হিজরত করার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। কিন্তু আমীর আমানুল্লাহ তাদেরকে

আফগানিস্তানে প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। এদের অধিকাংশ যাতায়াতের রাস্তার পাশে মৃত্যুবরণ করে।

১ আগস্ট (১৯২০) খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। এই আন্দোলনের প্রতি হিন্দু নেতৃবৃন্দের সমর্থন আদায় করার প্রয়োজন গান্ধী অনুধাবন করেন আন্দোলন শুরুর পরই। সেপ্টেম্বর মাসের ৪–৮ তারিখে কংগ্রেস পার্টির কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বিশেষ অধিবেশনে তিনি এই চেষ্টায় লিপ্ত হন। মতিলাল নেহরু ব্যতীত প্রায় সব খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। এদের মধ্যে ছিলেন অধিবেশনের সভাপতি লালা লাজপত রায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিণ চন্দ্র পাল এবং মদনমোহন মালব্য। তবে সম্মেলনে উপস্থিত হিন্দু-মুসলমান ডেলিগেটবৃন্দ গান্ধীকে সমর্থন করেন এবং তাঁর মতই গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ–

(ক) যে কোন অবৈতনিক (Honorary) পদ এবং স্থানীয় সরকারসমূহের (Local bodies) মনোনীত সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ;

(খ) কোন সরকারি দরবার, অনুষ্ঠান, চা-চক্র যা সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা বা তাদের সম্মানে অনুষ্ঠিত, সে সমস্ত অনুষ্ঠান বর্জন;

(গ) সন্তানগণকে সরকারি স্কুল-কলেজ থেকে ক্রমান্বয়ে প্রত্যাহার করা এবং বিভিন্ন প্রদেশে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন;

(ঘ) উকিল এবং মক্কেলগণ কর্তৃক বৃটিশ আদালত বর্জন এবং বেসরকারি সালিসী আদালত স্থাপন;

(ঙ) সামরিক বাহিনীর ভারতীয় সদস্যগণ, কেরাণীগণ এবং শ্রমিকগণ কর্তৃক মেসোপটেমিয়ায় কাজ করতে অস্বীকার করা;

(চ) পরিষদের সদস্যপদ প্রার্থীদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার এবং কংগ্রেসের উপদেশ অগ্রাহ্য করে কেউ পদপ্রার্থী হলে ভোটদাতাগণ কর্তৃক ভোটদানে অস্বীকৃতি;

(ছ) বিদেশী পণ্য বর্জন।

এই সময়ে এমন একটি ব্যাপারের সূত্রপাত হয় যা শুধুমাত্র খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনকে প্রভাবিত করেনি বরং পুরো হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ওপরও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। মূলত ঐ সময়ে গান্ধী ও জিন্নাহ্‌র মধ্যকার সম্পর্কের ক্রমাবনতি এবং ভাঙ্গন ধরে। দুই নেতার মধ্যে প্রথম খোলাখুলি বিরোধের শুরু হয় ৩ অক্টোবর (১৯২০ খ্রি.) বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হোম রুল লীগ (Home Rull League)-এর বৈঠকে। হোম রুল লীগের সভাপতি মিসেস এ্যানি বেসান্ত পদত্যাগ করলে মহাত্মা গান্ধী সেই পদে অধিষ্ঠিত হন এবং উক্ত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। এই সংগঠনকে চলমান আন্দোলনের আওতায় নিয়ে আসার জন্যে গান্ধী এর নীতির পরিবর্তন সাধন এবং নতুন নামকরণের প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবিত নাম ছিল 'স্বরাজ সভা'। জিন্নাহ্ এর বিরোধিতা করেন। গান্ধী তাঁকে দেশের সম্মুখে আগত 'নতুন জীবনে' অংশগ্রহণ করার জন্যে আহ্বান জানান। এর উত্তরে জিন্নাহ্‌র বক্তব্যের মধ্যে দু'জনের নীতিগত পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। জিন্নাহ বলেন, " 'নতুন জীবন' বলতে যদি আপনি আপনার কর্মপদ্ধতি এবং কর্মসূচি বুঝিয়ে থাকেন তাহলে আমার আশঙ্কা হচ্ছে আমি তা গ্রহণে অপারগ; কারণ আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ যে এর দ্বারা বিরাট বিপর্যয় ঘটে যাবে। আপাতত আপনার চরম কর্মসূচি অনভিজ্ঞ, তরুণ, অজ্ঞ এবং অশিক্ষিতদের কল্পনাকে নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছে। এই সমস্ত কিছুর অর্থ হবে চরম অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা।" উল্লেখযোগ্য যে, ঐ পর্যায়ে গান্ধী ও জিন্নাহর মধ্যে অনেক বিষয়ে মতের মিল ছিল: দু'জনই স্বরাজের সমর্থক, উভয়েই চাইতেন তুর্কি সুলতানের

প্রাক-যুদ্ধকালীন মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকুক। তদুপরি জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের জন্যে দায়ী ব্যক্তিগণ খুব নগণ্য শাস্তির মাধ্যমে অব্যাহতি পেয়েছে দেখে দুই নেতাই বৃটিশ সরকারের ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। খিলাফত-অসহযোগের প্রশ্নেও তাঁদের মধ্যে অনেক মিল ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় মতানৈক্যের বিষয় ছিল আন্দোলনের উপযুক্ত সময়।

জিন্নাহ মনে করতেন দেশ তখনও এত বড় আন্দোলনের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। অসময়ে আন্দোলন শুরু করলে সরকারের ক্ষতি হবে না, বরঞ্চ আন্দোলনকারীগণই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন এ জাতীয় আন্দোলনের জন্যে যত্নের সঙ্গে প্রস্তুত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। শেষ পর্যন্ত ডিসেম্বর (১৯২০ খ্রি.) মাসে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে এই মতানৈক্য চরমে পৌঁছে। জিন্নাহ অধিবেশন থেকে চলে আসেন। এরপর তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখেননি।

খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের কয়েকটি পৃথক পর্যায়ক্রম ছিল। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে জোর দেওয়া হয় ছাত্রগণ কর্তৃক স্কুল-কলেজ বর্জন এবং আইনজীবীদের আদালত বর্জনের ওপর। এই 'বুদ্ধিজীবী' আন্দোলন প্রাথমিকভাবে কিছু সফলতা অর্জন করে; কলিকাতা এবং লাহোরে বিরাট আকারে ছাত্র ধর্মঘট হয় এবং মতিলাল নেহরু ও চিত্তরঞ্জন দাশের মত খ্যাতনামা আইনজীবীগণ আইন ব্যবসা ত্যাগ করেন। তবে শীঘ্র এই পর্যায়ের আন্দোলনের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়।

এপ্রিল মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বিজয়াওয়াদা বৈঠকে মত প্রকাশ করা হয় যে, দেশ তখনও পর্যন্ত আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য 'যথোপযুক্তরূপে সুশৃঙ্খল, সংগঠিত এবং পরিপক্ক ছিল না।' এই বৈঠকে আর একটু কম সংগ্রামী কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়; সেটা ছিল তিলক স্বরাজ ফান্ডের জন্যে এক কোটি টাকা উত্তোলন, এর জন্য এক কোটি লোককে কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। জুলাইয়ের শেষ দিকে কংগ্রেস কমিটি বোম্বাইতে মিলিত হয় এবং দলের সাধারণ কর্মীদের চাপে কিছুটা জঙ্গি মনোভাব নিতে বাধ্য হয়। পরবর্তী অসহযোগ কর্মসূচির মধ্যে ছিল বিদেশি কাপড় বর্জন ও প্রকাশ্যে পোড়ানো এবং নভেম্বর মাসে প্রিন্স অফ ওয়েলসের ভারত ভ্রমণ সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি বর্জন। অবশ্য খাজনা না দেওয়ার মাধ্যমে পুরাদস্তর আইন অমান্য আন্দোলন তখনও স্থগিত রাখা হয়। এই সভায় গান্ধী আহ্বান জানান যে, কংগ্রেস কর্মী ও আন্দোলনের সমর্থকগণ যেন স্বেচ্ছায় গ্রেফতার হয়ে কারাবাস বরণ করে; কারণ এটাই হবে আন্দোলনের এক বড় বিজয়। এই পর্যায়ে বোম্বাইতে অসহযোগ আন্দোলন সহিংস আকারও ধারণ করে, যে জন্য গান্ধী খুব মর্মাহত হন।

আন্দোলনের শেষ পর্যায় ছিল নভেম্বর (১৯২১ খ্রি.) থেকে ফেব্রুয়ারি (১৯২২ খ্রি.) পর্যন্ত। এই সময়ে আন্দোলনের তোড়ে সরকার বেশ বেকায়দায় পড়ে। নভেম্বর মাসে আলী ভ্রাতৃদ্বয়কে গ্রেফতার করা হয়। তাঁদের অপরাধ ছিল এই যে, তাঁরা জুলাই মাসে করাচী খিলাফত কনফারেন্সের বৈঠকে মুসলমানদেরকে সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগের আহ্বান জানান। এতে রাগান্বিত হয়ে হসরত মোহানীর মত খিলাফত নেতা পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানান এবং অহিংস নীতি পরিত্যাগের আহ্বান জানান।

শেষ পর্যন্ত গান্ধী শুধুমাত্র বারদোলিতে খাজনা বন্ধ করার আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেন, যা শুরু হওয়ার কথা ছিল ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে। কিন্তু ৫ ফেব্রুয়ারিতে চৌরিচৌরায় সংঘটিত সহিংসতার ফলে তিনি সম্পূর্ণ আন্দোলন হঠাৎ বন্ধ করে দেন। উত্তর প্রদেশের গোরখপুর জেলার চৌরিচৌরায় আন্দোলনরত কৃষকগণ বাইশ জন পুলিশকে পুড়িয়ে মারে। এরূপ ভয়াবহ সহিংস রূপ ধারণ করছে দেখে গান্ধী খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা করেন।

গান্ধীর এই আকস্মিক এবং একতরফা সিদ্ধান্তের বিরোধী ছিলেন কংগ্রেসের বেশির ভাগ শীর্ষ নেতা। কিন্তু গান্ধী তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলেন। তাঁর পক্ষে বলা যায় যে, তিনি একটি অহিংস এবং নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। শ্রেণী সংগ্রাম বা সমাজ বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে তিনি মোটেই উৎসাহী ছিলেন না। তাঁর একার কথায় আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাওয়াটাও এর দুর্বলতার পরিচায়ক। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হলেও বিকল্প এবং বিপ্লবী নেতৃত্বের অভাব ছিল। আন্দোলন থেমে যাওয়ায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় খিলাফতী মুসলমানগণ। এই অবস্থায় তাদের কি করণীয় তাও তারা বুঝতে পারছিল না। খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিও দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তী কয়েক বছর ধরে ভারতের বিভিন্ন শহরে ব্যাপক হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। এভাবে ভারত ধীরে ধীরে অনৈক্য এবং সংঘাতের দিকে এগিয়ে যায়।

সারসংক্ষেপ

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলোতে বৃটিশ ভারতের প্রধান রাজনৈতিক ঘটনা। যুদ্ধে জার্মানির পক্ষাবলম্বনের ফলে সৃষ্ট ভাগ্য বিপর্যয়ের হাত থেকে তুর্কি সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা এবং মুসলিম বিশ্বের খলিফা হিসেবে সুলতানের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে খিলাফত আন্দোলন শুরু হয়। মুসলমানদের বৃটিশ বিরোধী মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে বৃহত্তর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহাত্মা গান্ধী খিলাফতের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। এর ফলে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সৃষ্টি হয় যা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু-মুসলিম সৌহার্দ্যের একটা অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। তবে আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃবৃন্দের মধ্যে আপোষকামিতা এবং দ্বিধাদ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। তদুপরি খিলাফত রক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা উত্তরোত্তর তিরোহিত হওয়ার ফলে হতাশার সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯২২ খ্রি. ৫ ফেব্রুয়ারিতে সংঘটিত চৌরিচৌরা সহিংসতার ফলে গান্ধী আকস্মিকভাবে আন্দোলন বন্ধ করার ঘোষণা দেন। এতে মুসলিম খিলাফতীগণ খুবই হতাশ হন এবং হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিও দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

1. S.M. Burke and Salim Al-Din Quraishi, *The British Raj in India*: *An Historical Review,* Dhaka, 1995.
2. Sumit Sarker, *Modern India, 1885-1947,* Delhi, 1983.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। তুর্কি সাম্রাজ্যের অন্য নাম ছিল–

(ক) ফাতেমীয় সাম্রাজ্য (খ) সেলজুর সাম্রাজ্য

(গ) উসমানীয় সাম্রাজ্য (ঘ) কোনটিই নয়।

২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক কোন দেশের পক্ষাবলম্বন করে?

(ক) রাশিয়ার (খ) আমেরিকার

(গ) জার্মানির (ঘ) চীনের।

৩। খিলাফত আন্দোলনে খ্যাতনামা মুসলিম নেতৃবৃন্দের অন্যতম ছিলেন–

(ক) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (খ) মোহাম্মদ আলী
(গ) লিয়াকত আলী (ঘ) সবাই।

৪। অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান কৌশল ছিল–
(ক) বিদেশী পণ্য বর্জন (খ) বিদেশী শাসককে আক্রমণ
(গ) জমির খাজনা বন্ধ করা (ঘ) কোনটিই নয়।

৫। চৌরিচৌরা কোথায় অবস্থিত?
(ক) বাংলায় (খ) বিহারে
(গ) উত্তর প্রদেশে (ঘ) উড়িষ্যায়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। তুরস্কের প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের সহানুভূতির কারণ কি?
২। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ওপর খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব কি ছিল?
৩। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হয় কেন?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন।
২। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা পর্যালোচনা করুন।

পাঠ - ৪

নেহেরু রিপোর্ট ও জিন্নাহ্‌র চৌদ্দ দফা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *নেহেরু রিপোর্ট প্রণয়নের পটভূমি জানতে পারবেন;*
- *এই রিপোর্টের প্রধান সুপারিশসমূহ বলতে পারবেন;*
- *মুসলিম লীগের দাবি সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *চৌদ্দ দফা প্রণয়নের কারণ বলতে পারবেন;*
- *দফাসমূহের বিবরণ দিতে পারবেন।*

বৃটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির উদ্দেশ্যে সুপারিশ করার জন্যে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে সাইমন কমিশন গঠিত হয়। এর সদস্যদের সবাই ছিলেন শ্বেতাঙ্গ। কমিশনে কোন ভারতীয় সদস্য না থাকায় দলমত নির্বিশেষে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ শুরু থেকেই এর বিরোধিতা করেন। একই সঙ্গে এই কমিশনের গঠন ও পরিকল্পিত কর্মসূচি ভারতীয় নেতৃত্বের প্রতি ছিল একটি চ্যালেঞ্জ, যার মূলকথা ছিল ভারতের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে নিজেদের ভেতর একটা মতৈক্য। কাজেই সাইমন কমিশন গঠনের পর নেতৃবৃন্দ একটা ডোমিনিয়ন সংবিধান প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন লিবারেল নেতা তেজবাহাদুর সাপ্রড, মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং কংগ্রেস নেতা মতিলাল নেহরু। শেষোক্ত জনকে আহ্বায়ক নিযুক্ত করে যে কমিটি গঠিত হয় তার পেশকৃত সুপারিশমালা নেহরু রিপোর্ট নামে খ্যাত। নেহেরু রিপোর্ট শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ কর্তৃক গৃহীত হয়নি। লীগের পক্ষ থেকে বিকল্প শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা পেশ করা হয় যা জিন্নাহ্‌র চৌদ্দ দফা নামে পরিচিত। উভয় পরিকল্পনা দলীয় চিন্তার উর্ধ্বে ওঠে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে শাসনতান্ত্রিক রূপরেখা নির্মাণে ব্যর্থ হয়। কাজেই নেহরু রিপোর্ট এবং জিন্নাহ্‌র চৌদ্দ দফা সাম্প্রদায়িক সমস্যার অচলায়তন ভাঙ্গার ব্যাপারে নেতৃবৃন্দের অক্ষমতার নিদর্শন।

১৯২৭ খ্রি. শেষ দিকে সাইমন কমিশন গঠিত হওয়ার প্রাক্কালে ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্যের সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল ছিল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগসহ প্রায় সকল প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল উক্ত কমিশন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। শুধুমাত্র কতক আঞ্চলিক দল (উদাহরণ স্বরূপ, মাদ্রাজের জাস্টিস পার্টি এবং পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট পার্টি) এই নীতির ব্যতিক্রম ছিল। ইতোমধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠার জন্যে লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কিছু অবদান রাখেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে দিল্লির সর্বদলীয় সম্মেলনে তিনি অন্যান্য মুসলিম নেতাকে কংগ্রেসের সঙ্গে একটা আপোষ রফায় রাজি করাতে সক্ষম হন। মুসলিম নেতৃবৃন্দ কিছু শর্তসাপেক্ষে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার পরিবর্তে যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা মেনে নিতে সম্মত হন। শর্তসমূহ ছিল: সংখ্যালঘুদের জন্যে আসন সংরক্ষণ, কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মুসলমানদের জন্যে এক-তৃতীয়াংশ আসন বরাদ্দ, বাংলা ও পাঞ্জাবে জনসংখ্যার অনুপাতে সম্প্রদায়গত প্রতিনিধিত্বের হার নির্ধারণ এবং তিনটি নতুন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ গঠন (সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ)। ডিসেম্বর (১৯২৭

খ্রি.) মাসে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে জিন্নাহ্‌র উপর্যুক্ত পরিকল্পনা গৃহীত হয়। কিন্তু শীঘ্রই পাঞ্জাব এবং মহারাষ্ট্র থেকে হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক চাপ কংগ্রেসকে এই আপোষ ফর্মুলা প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য করে। এর ফল হয়েছিল মারাত্মক। নেহরু রিপোর্টে এই ফর্মুলার সার্বিক প্রতিফলন ঘটেনি বলে জিন্নাহ এই রিপোর্ট গ্রহণে অস্বীকার করেন।

১৯২৮ সনের আগস্ট মাসে নেহরু রিপোর্ট প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়। রিপোর্টের প্রধান সুপারিশসমূহ ছিল নিম্নরূপ–

(১) সর্বত্র যৌথ নির্বাচন প্রথা চালু হবে ;

(২) মুসলমানদের জন্যে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে কেন্দ্রে এবং মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশসমূহে ;

(৩) সিন্ধুকে বোম্বাই থেকে পৃথক করে একটি প্রদেশের মর্যাদা দেওয়া হবে; কিন্তু তা করা হবে ভারত ডোমিনিয়নের মর্যাদা লাভ করার পর। সেখানকার হিন্দু সংখ্যালঘুদের জন্যে অনুপাতের অতিরিক্ত গুরুত্বের (weightage) ব্যবস্থা করা হবে ;

(৪) রাজনৈতিক কাঠামো হবে মূলত এক-কেন্দ্রিক এবং কেন্দ্রের হাতে থাকবে অতিরিক্ত (residual) ক্ষমতা।

নেহরু রিপোর্ট মুসলমানদের ভীতি দূর করে তাদের স্বার্থের প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হয়। স্পষ্টতই দেখা যায় যে, এতে জিন্নাহর আপোষনীতি অগ্রাহ্য হয়েছে। রিপোর্টের যে অংশ মুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট সবচেয়ে বেশি আপত্তিকর মনে হয়েছে তা ছিল অবশিষ্ট (residual) ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে রাখার সুপারিশ, কার্যত এর ফলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অস্বীকার করা হয়। ফলে জিন্নাহ কর্তৃক শর্তসাপেক্ষে যুক্ত নির্বাচন প্রথা গ্রহণ তাৎপর্যহীন হয়ে যায়। নেহরু রিপোর্টের আরেক ক্ষতিকর দিক ছিল এর দ্বারা লখনৌ চুক্তি (১৯১৬ খ্রি.) সত্যিকার অর্থে বাতিল হয়ে যাওয়া। এই চুক্তি ছিল কংগ্রেস-লীগ সমঝোতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই চুক্তি অস্বীকারের জন্যে মুসলিম নেতৃত্ব কখনও কংগ্রেসকে ক্ষমা করেনি। জিন্নাহ এবং আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের মতো প্রভাবশালী মুসলিম নেতা এই রিপোর্টের ফলে কংগ্রেসের প্রতি সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। অতপর তাঁরা মুসলমানদের জন্যে রক্ষাকবচ (safeguards)-এর ব্যবস্থা করার জন্যে আরো জোরালো দাবি উত্থাপন করেন।

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর কলিকাতায় একটা সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নেহরু রিপোর্টের বিচার-বিশ্লেষণ করা। মুসলিম লীগের তরফ থেকে জিন্নাহ বিরাজমান অচলাবস্থার একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাধানের চেষ্টা করেন। তিনি পূর্ববর্তী বছরের মার্চ মাসে পেশকৃত তাঁর আপোষনীতি পুনরুত্থাপন করেন। জিন্নাহ অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় বলেন, "আপনারা কি চান না যে ভারতের সাত কোটি মুসলমান আপনাদের সাথে থাকুক?" কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ নেহরু রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারতের ভবিষ্যত শাসনতান্ত্রিক কাঠামো তৈরির ব্যাপারে অটল থাকেন। জিন্নাহ একজন হতাশ মানুষ হিসেবে কলিকাতার সম্মেলন ত্যাগ করেন। বোম্বাই ফিরে যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি একজন পার্সী বন্ধুকে সজল চক্ষে বলেছিলেন, "এখানেই আমাদের রাস্তা আলাদা হয়ে গেল।" [This is the parting of the ways.] নেহরু রিপোর্টের অন্যতম প্রণেতা তেজবাহাদুর সাপ্রুড জিন্নাহর দাবি মেনে নেওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন; কিন্তু তাঁর মত গ্রাহ্য করা হয়নি।

২৮ মার্চ (১৯২৯ খ্রি.) দিল্লিতে মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে জিন্নাহ তাঁর চৌদ্দ দফা পেশ করেন। এই দফাসমূহ ছিল জিন্নাহ কর্তৃক নেহরু রিপোর্টের প্রত্যুত্তর। পরবর্তী দিনগুলোতে চৌদ্দ দফা মুসলিম রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। চৌদ্দ দফাসমূহ নিম্নে উল্লেখিত হল ঃ

(১) ভবিষ্যত শাসনতান্ত্রিক কাঠামো যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal) হবে এবং বাড়তি (residuary) ক্ষমতা প্রদেশসমূহের কাছে ন্যস্ত থাকবে;

(২) সব প্রদেশকে সমপরিমান স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে;

(৩) দেশের সমস্ত আইনসভায় এবং অন্যান্য নির্বাচিত পরিষদসমূহে সংখ্যালঘুদের পর্যাপ্ত এবং যথার্থ প্রতিনিধিত্ব থাকবে। কোন প্রদেশে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘুর সমপর্যায়ে নামানো যাবে না;

(৪) কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশের কম হবে না;

(৫) বর্তমানে প্রচলিত পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা চালু থাকবে। তবে কোন সম্প্রদায় যে কোন সময় যুক্ত নির্বাচনী প্রথা গ্রহণ করতে পারবে;

(৬) কোন সময়ে কোন এলাকাগত পুনর্বন্টন (Territorial redistribution) প্রয়োজন হলে তা কোনভাবে পাঞ্জাব, বাংলা এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অবস্থান ক্ষুন্ন করতে পারবে না;

(৭) সকল সম্প্রদায়ের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে;

(৮) কোন নির্বাচিত পরিষদের যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত তিন-চতুর্থাংশ সদস্য যদি কোন বিলের বিরুদ্ধে এই মর্মে আপত্তি উত্থাপন করে যে, উক্ত বিল সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের স্বার্থহানি করে তবে ঐ বিল উক্ত পরিষদে গৃহীত হবে না। সেই ক্ষেত্রে অন্য কোন সম্ভাব্য ও বাস্তবসম্মত বিকল্পের ব্যবস্থা করতে হবে;

(৯) সিন্ধুকে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি থেকে পৃথক করতে হবে;

(১০) অন্যান্য প্রদেশের মত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানে সংস্কার প্রবর্তন করতে হবে;

(১১) এইমর্মে শাসনতান্ত্রিক বিধান থাকতে হবে যাতে মুসলমানগণ অন্যান্য ভারতীয়দের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে চাকুরির পর্যাপ্ত সুযোগ লাভ করতে পারে;

(১২) শাসনতন্ত্রে পর্যাপ্ত রক্ষাকবচের (Safeguards) মাধ্যমে মুসলিম সংস্কৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা, ভাষা, ধর্ম, ব্যক্তিগত আইন এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের বন্দোবস্ত করতে হবে। রাষ্ট্র এবং অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানে উক্ত বিষয়সমূহের যথাযোগ্য অংশীদারিত্ব থাকতে হবে;

(১৩) কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ মুসলমান মন্ত্রি ব্যতীত কেন্দ্রে বা প্রদেশে কোন মন্ত্রিসভা গঠন করা যাবে না;

(১৪) ভারতীয় ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশসমূহের সম্মতি ব্যতীত আইনসভা কোন শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধন করতে পারবে না।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পরস্পর বিরোধী অবস্থানের ফলে ভারতের শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। এরপর দুই দলের মধ্যকার দূরত্ব আরো বেড়ে যায়। জিন্নাহ উত্তরোত্তর কংগ্রেসকে একটা হিন্দু সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করেন। তিনি মনে করেন যে, এই সংগঠনের কাছ থেকে ভারতীয় মুসলমানগণ কোন সুবিচার আশা করতে পারে না। তিনি আরো শক্তিশালী অবস্থান থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে দর কষাকষির জন্যে মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। এ জাতীয় চিন্তার মধ্যেই ভারতীয় মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র আবাসভূমি তথা পাকিস্তান আন্দোলনের বীজ নিহিত ছিল।

সারসংক্ষেপ

১৯২৭ খ্রি. শেষ দিকে সাইমন কমিশন গঠিত হয় বৃটিশ ভারতের ভবিষ্যত শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্যে। এই কমিশনে কোন ভারতীয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সাইমন কমিশনের গঠন এবং কর্মসূচি ছিল ভারতীয় নেতৃত্বের প্রতি বৃটিশ সরকারের একটা চ্যালেঞ্জস্বরূপ। ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ এই কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে। শাসনতন্ত্রের মূলনীতি প্রণয়নের নিমিত্তে একটা কমিটি গঠিত হয় কংগ্রেস নেতা মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে। এই কমিটির পেশকৃত রিপোর্ট ছিল নেহরু রিপোর্ট। সর্বদলীয় সম্মতির ভিত্তিতে উক্ত কমিটি গঠিত হলেও এর রিপোর্ট অন্যতম প্রধান দল মুসলিম লীগের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি। এই রিপোর্টের বিকল্প হিসেবে লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ তাঁর চৌদ্দ দফা পেশ করেন যা কংগ্রেস অগ্রাহ্য করে। ফলে রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক ভাবধারা বৃদ্ধি পায় এবং ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় জাতীয়তার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

1. S.M. Burke and Salim Al-Din Quraishi, *The British Raj in India: An Historical Review*, Dhaka, 1995.
2. Sumit Sarkar, *Modern India, 1885-1947*, Delhi, 1983.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিম্নে কোন দল সাইমন কমিশনের সহিত সহযোগিতা করে?
(ক) কংগ্রেস (খ) উলামা-ই-হিন্দ
(গ) জাস্টিস পার্টি (ঘ) মুসলিম লীগ।

২। মুসলিম লীগ নেহরু রিপোর্ট–
(ক) গ্রহণ করে (খ) বর্জন করে
(গ) মত প্রকাশে বিরত থাকে (ঘ) কোনটিই নয়।

৩। জিন্নাহ শর্তসাপেক্ষে যৌথ নির্বাচন প্রথা গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন–
(ক) মিথ্যা (খ) সত্য
(গ) অপ্রাসঙ্গিক (ঘ) আংশিক সত্য।

৪। নেহরু রিপোর্ট কোন ধরনের শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর সুপারিশ করে?
(ক) এক-কেন্দ্রিক (খ) যুক্তরাষ্ট্রীয়
(গ) কনফেডারেল (ঘ) সবগুলোই।

৫। জিন্নাহর চৌদ্দ দফায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে কি বলা হয়েছিল?
(ক) সমর্থন করা হয়েছিল (খ) বিরোধিতা করা হয়েছিল
(গ) কিছু বলা হয়নি (ঘ) কোনটিই নয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। নেহরু কমিটি কেন গঠন করা হয়? এর প্রধান সুপারিশগুলো কি ছিল?
২। জিন্নাহ কর্তৃক পেশকৃত আপোষ ফর্মুলাসমূহ কি?
৩। চৌদ্দ দফার সারমর্ম আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। নেহরু রিপোর্টের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? কেন মুসলিম লীগ এই রিপোর্ট গ্রহণে অস্বীকার করে?
২। শাসনতান্ত্রিক নীতি হিসেবে নেহরু রিপোর্ট এবং জিন্নাহর চৌদ্দ দফার তুলনামূলক আলোচনা করুন।

পাঠ - ৫

গোলটেবিল বৈঠক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *গোল টেবিল বৈঠকের পটভূমি সম্পর্কে বলতে পারবেন;*
- *বৈঠকসমূহের প্রধান আলোচ্য বিষয় জানতে পারবেন;*
- *গোল টেবিল বৈঠকের ব্যর্থতার কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।*

১৯২৭ থেকে ১৯৩০ খ্রি. পর্যন্ত কয়েক বছর ভারতবর্ষের ভবিষ্যত সাংবিধানিক কাঠামো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা এবং আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। এ সময়ে যে সত্যটি পরিষ্কার হয়ে যায় তা ছিল এই যে, যে কোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনার গ্রহণযোগ্যতা ত্রিপক্ষীয় মতৈক্যের ওপর নির্ভরশীল; সেই তিন পক্ষ ছিল বৃটিশ সরকার, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ। এছাড়াও অন্যান্য ছোট ছোট দল ও স্বার্থের প্রশ্নও জড়িত ছিল, যথা– হিন্দু মহাসভা, শিখ সম্প্রদায়, দেশীয় রাজ্যসমূহ, ভারতীয় খ্রিস্টান সম্প্রদায় ইত্যাদি। তবে ইতোমধ্যে দেখা গেছে যে, প্রধান তিন পক্ষের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে প্রবল মতানৈক্য ছিল। তদুপরি ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে পেশকৃত সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ভারতীয় দলগুলো কর্তৃক গৃহীত হবে এমন সম্ভাবনা ছিল না, কেননা প্রায় সবক'টি প্রধান দল সাইমন কমিশন বয়কট করেছিল। ইতোমধ্যে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যকার সমঝোতার অভাব এবং উভয় দলের অবস্থান যথাক্রমে নেহরু রিপোর্ট এবং জিন্নাহর চৌদ্দ দফার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে।

এমতাবস্থায় বৃটিশ সরকার লন্ডনে একটা সর্বদলীয় গোলটেবিল বৈঠকের সম্ভাবনার কথা ঘোষণা করে। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার বেশ কয়েকমাস আগেই ভাইসরয় লর্ড আরউইন ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ৩১ অক্টোবর এই ঘোষণা দেন। কিন্তু ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে 'পূর্ণ স্বরাজ' অর্জন দলের লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। অর্থাৎ অতপর কংগ্রেসের দাবি কেবলমাত্র ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস-এর মধ্যে সীমিত থাকল না।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১২ মার্চ থেকে গান্ধী লবণ করের বিরুদ্ধে আইন অমান্য (civil disobedience) আন্দোলন শুরু করেন। ঐ দিন তিনি সবরমতি আশ্রম থেকে সমুদ্র তীরবর্তী ডান্ডির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে এপ্রিলের ৫ তারিখ তিনি গন্তব্যে পৌঁছেন। পরদিন আইন অমান্যের উদ্দেশ্যে নিজ হাতে সমুদ্রতীরে লবণ তৈরি করেন। গান্ধীর কার্যক্রমের প্রতি সারা ভারতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীসহ কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। সুতরাং, শুরুতেই সর্বদলীয় গোলটেবিল বৈঠকের সাফল্যের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যায়।

কংগ্রেস পার্টি যোগদান করবে না এটা নিশ্চিত জেনেও বৃটিশ সরকার গোলটেবিল বৈঠকের ব্যাপারে অগ্রসর হয়। জুলাই মাসে (১৯৩০) ভাইসরয় কংগ্রেসকে বৈঠকে যোগদানে রাজি করানোর উদ্যোগ নেন। তিনি এই মর্মে আশ্বাস দেন যে, সম্মেলনের কার্যক্রম সাইমন কমিশনের রিপোর্ট দ্বারা বাধাগ্রস্ত হবে না। এছাড়া লিবারেল নেতা তেজবাহাদুর সাপ্রুভ ও এম.আর. জয়াকরকে জেলখানায় গান্ধী, মতিলাল নেহরু এবং জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে বাদ দিয়ে কংগ্রেসের পক্ষে বৈঠকে যোগদান সম্ভবপর ছিল না।

গোলটেবিল বৈঠক যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশন চলে ১২ নভেম্বর ১৯৩০ থেকে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজা পঞ্চম জর্জ এবং এতে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড। ৮৯জন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করেন। কংগ্রেস ব্যতীত সমস্ত ছোট বড় ভারতীয় রাজনৈতিক দল এতে অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও যোগদান করেন দেশীয় রাজ্যসমূহ এবং তিন বৃটিশ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ। মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আগা খান, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মোহাম্মদ শফি এবং মোহাম্মদ আলী প্রমুখ। লিবারেল দলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সাপ্রুভ ও জয়াকর এবং হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন বি.এস. মুন্‌জে। এছাড়া ছিলেন শিখনেতা সম্পূরণ সিং ও উজ্জ্বল সিং, অস্পৃশ্য নেতা বি.আর. আম্বেদকর, এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান নেতা কর্নেল গিডনি, ভারতীয় খ্রিস্টানদের নেতা কে.টি. পল এবং ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রতিনিধি হুবার্ট কার। দেশীয় রাজ্যগুলোর পক্ষ থেকে যোগদান করেন বিকানির, কাশ্মির, ভোপাল ও পাতিয়ালার নৃপতিবৃন্দ এবং হায়দ্রাবাদ, মহীশূর ও গোয়ালিয়রের প্রধামন্ত্রীগণ।

ইতোমধ্যে বৃটিশ সরকার প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা দিতে প্রস্তুত হয়। এর প্রেক্ষিতে দুটি সমস্যার সমাধান বিশেষ জরুরি বলে প্রতীয়মান হয়। প্রথমটি ছিল দেশীয় রাজ্যসমূহের ফেডারেশনভুক্তির প্রশ্ন, দ্বিতীয়টি ছিল সাম্প্রদায়িক সমস্যা। প্রথমটির ব্যাপারে সম্মেলন একটা সমাধান খুঁজে পাবে বলে আশার সঞ্চার হয়। দ্বিতীয় সমস্যাটি বরাবরের মত দুর্লঙ্ঘ্য বিবেচিত হয়।

অধিবেশনের প্রথম বক্তা ছিলেন তেজবাহাদুর সাপ্রুভ। তিনি দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিদেরকে দেশের মঙ্গলের জন্য ফেডারেশনে যোগদানের আহ্বান জানান। প্রত্যুত্তরে নৃপতিদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন বিকানিরের মহারাজা। তিনি স্বীকার করেন যে, ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান একটা সর্বভারতীয় ফেডারেশনের মধ্যে নিহিত। তবে তিনি এ ব্যাপারে ধীরে সুস্থে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের ওপর কোন প্রকার জবরদস্তির পথ পরিহার করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ভারতীয় রাজন্যবর্গ ফেডারেশনে যোগদান করতে প্রস্তুত শুধুমাত্র নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তিতে এবং এই শর্তসাপেক্ষে যে এতে তাঁদের রাজ্যের এবং জনগণের ন্যায্য অধিকার রক্ষিত হবে।

সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান অনেক দুরূহ কাজ বলে প্রমাণিত হয়। এই সমস্যা আরো জটিলতর হয়ে ওঠে যখন ড. আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক নির্বাচনের অধিকার দাবি করেন। অপরদিকে মুসলিম প্রতিনিধিবৃন্দ প্রত্যাশিতভাবেই মুসলমানদের জন্য রক্ষাকবচ (safeguards) ব্যতীত কোন শাসনতান্ত্রিক

ফর্মুলা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। শেষ পর্যন্ত ভবিষ্যত সাংবিধানিক কাঠামোর ব্যাপারে কোন অগ্রগতি হয়নি। ফলে ১৯ জানুয়ারি (১৯৩১) গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন সমাপ্ত হয়ে যায়।

ইতোমধ্যে গান্ধী এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দেওয়া হয়। প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা মতিলাল নেহরু ৫ ফেব্রুয়ারি (১৯৩১) মারা যান। রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনের জন্য সাপ্রুড প্রমুখ লিবারেল নেতৃবৃন্দ ভাইসরয়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য গান্ধীকে সম্মত করান। ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে গান্ধী-আরউইন আলোচনা হয়– যা ৫ মার্চ একটা চুক্তিতে পরিণতি লাভ করে। এই ছিল বিখ্যাত গান্ধী-আরউইন চুক্তি। পরবর্তী গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীর যোগদানের জন্য এই সমঝোতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর প্রধান শর্তসমূহ ছিল নিম্নরূপ–

১) আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত করা হবে;

২) রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে বৃটিশ পণ্য বর্জনের নীতি ত্যাগ করা হবে;

৩) সাধারণ আইনের পরিসীমার মধ্যে ভারতীয় পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ এবং মাদকদ্রব্য বর্জনের আন্দোলন ইত্যাদি পরিচালিত হবে;

৪) যাদের বাসস্থানের নিকট লবণ তৈরি করা সম্ভব তারা লবণ তৈরি করতে পারবে, তবে বিক্রির জন্য নয়;

৫) সহিংসতার অপরাধ ব্যতীত আইন অমান্য আন্দোলনকালে গ্রেফতারকৃতদেরকে মুক্তি দেওয়া হবে।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে যাঁরা খুব শীঘ্র স্বাধীনতার কথা ভাবছিলেন তাঁদেরকে গান্ধী- আরউইন চুক্তি হতাশ করে। তথাপি ২৯ মার্চ করাচিতে অনুষ্ঠিত দলের পুর্ণাঙ্গ অধিবেশনে (Plenary Session) এই চুক্তি অনুমোদিত হয়। চুক্তির কড়া সমালোচকদের অন্যতম জওহরলাল নেহরু শেষ পর্যন্ত অনুমোদনের পক্ষে প্রস্তাব করেন। তবে এই অধিবেশনে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য অক্ষুন্ন থাকবে বলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একই সঙ্গে পরবর্তী গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস প্রতিনিধি হিসেবে গান্ধীকে প্রেরণের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ৭ সেপ্টেম্বর শুরু হয় এবং ১ ডিসেম্বর শেষ হয়। এই বৈঠকে গান্ধীই একমাত্র নবাগত ছিলেন না, আরো কয়েকজন নেতা প্রথমবারের মত যোগদান করেন। তন্মধ্যে ছিলেন মদনমোহন মালব্য, ড. মোহাম্মদ ইকবাল এবং সরোজিনী নাইডু। যেমন আশা করা গিয়েছিল, সকলের মনোযোগ গান্ধীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল সর্বাপেক্ষা বেশি, কিন্তু শুরুতেই তিনি তিক্ততার সৃষ্টি করেন। তিনি দাবি করেন যে কংগ্রেস সমস্ত ভারতীয় স্বার্থ, শ্রেণী এবং সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। এই দাবি কত অসার তা অল্পদিনের মধ্যেই প্রমাণিত হয় যখন তিনি সংখ্যালঘু কমিটির সদস্য হিসেবে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করতে বাধ্য হন।

সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড বলেন যে, যদি ভারতীয়রা সম্প্রদায়গত প্রশ্নে ঐকমত্যে পৌঁছতে না পারে তবে বৃটিশ সরকার একটা অন্তবর্তীকালীন পরিকল্পনা (Provisional scheme) দিতে বাধ্য হবে। এই অধিবেশনেও ড. আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার দাবিতে অটল থাকেন। মৌলিক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতা সত্ত্বেও দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়– (১) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে গভর্নর-শাসিত প্রদেশে পরিণত করা হবে; (২) সিন্ধুকেও একই মর্যাদা দেওয়া হবে যদি তা আর্থিকভাবে সমুচিত বিবেচিত হয়।

ফেডারেশনের ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়। উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষের মধ্যে ক্ষমতার ভাগাভাগি, ফেডারেশনে যোগদানের বিনিময়ে দেশীয় রাজন্যবর্গের বিভিন্ন দর কষাকষি ইত্যাদি কারণে প্রথম বৈঠকে একটা ভারতীয় ফেডারেশন গঠনের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তা দ্বিতীয় বৈঠকে নস্যাৎ হয়ে যায়। হিন্দু-মুসলিম অনৈক্যের সুযোগে রাজন্যবর্গ ফেডারেশনে যোগদানের ইতিবাচক অবস্থান থেকে সরে যান। কাজেই দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের ফলাফলও আশানুরূপ হয়নি।

ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে গান্ধী দেশে ফিরে খুবই উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের পূর্বেই ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে আপোসপন্থী আরউইনের স্থলে কঠোর নীতিতে বিশ্বাসী লর্ড উইলিংডনকে ভাইসরয় পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। বাংলায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন তখন তুঙ্গে। তদুপরি নেহরুর নেতৃত্বে যুক্তপ্রদেশে খাজনা বন্ধের (no tax) আন্দোলন শুরু হয়। সীমান্ত প্রদেশে 'লালকোর্তা' নেতা আবদুল গাফফার খান বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ করেন। গান্ধীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই গাফফার খান, তাঁর ভাই ডা. খান সাহেব এবং জওহরলাল নেহরু কারারুদ্ধ হন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৪ জানুয়ারি গান্ধী এবং বল্লভভাই প্যাটেলকে গ্রেফতার করা হয়।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ বছরের ১৭ নভেম্বর থেকে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে গোলটেবিল বৈঠকের তৃতীয় ও শেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল সবচেয়ে কম তাৎপর্যপূর্ণ অধিবেশন; এতে মাত্র ৪৬ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ছিলেন অন্তরীণ।কোন বৃহৎ দেশীয় রাজ্যের শাসক ব্যক্তিগতভাবে যোগদান করেননি, যদিও অনেকে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন। এমনকি বৃটেনের বিরোধীদল লেবার পার্টিও এ অধিবেশনে অনুপস্থিত ছিল। কাজেই এই বৈঠকে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে না বা পুরাতন সমস্যাসমূহের কোন নতুন সমাধান পাওয়া যাবে না তা বুঝতে কারো অসুবিধা হয়নি।

যেসব শর্তের ওপর একটা গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক কাঠামো প্রণয়ন নির্ভরশীল ছিল তা পূরণ হয়নি। গোলটেবিল বৈঠকসমূহের আগে, বৈঠক চলাকালীন সময়ে বা মধ্যবর্তী সময়ে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলে এর মধ্যেই গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতার কারণ নিহিত ছিল। ভারতীয়দের মধ্যে অনৈক্যের সুযোগে পরবর্তী বছরগুলোতে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ নিজস্ব ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে তৎপর হয়।

সারসংক্ষেপ

ভারতবর্ষের জন্য একটা গ্রহণযোগ্য শাসনতান্ত্রিক কাঠামো প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর থেকে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের তিনটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ও শেষ বৈঠকের প্রাক্কালে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ ছিলেন। শুধু দ্বিতীয় অধিবেশনে কংগ্রেস দলের প্রতিনিধি হিসেবে মহাত্মা গান্ধী যোগদান করেন। অধিবেশনসমূহে মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য দল ও স্বার্থের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাটোয়ারা, ফেডারেশনের গঠন পদ্ধতি ইত্যাকার জরুরি বিষয়ে ভারতীয়দের মধ্যে মতৈক্যের অভাবে গোলটেবিল বৈঠক শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অতপর বৃটিশ কর্তৃপক্ষ স্বীয় ইচ্ছানুসারে ভারতীয় সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১. S.M. Burke and Salim Al-Din Quraishi, *The British Raj in India: An Historical Review,* Dhaka,1995.
২. Sumit Sarkar, *Modern India, 1885-1947*, Delhi, 1983.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বৃটিশ ভারতে যে কোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় সাফল্যের জন্য প্রয়োজন ছিল–

(ক) কংগ্রেসের সম্মতি (খ) মুসলিম লীগের সম্মতি

(গ) বৃটিশ সরকারের সম্মতি (ঘ) উপরোক্ত তিনপক্ষের মধ্যে মতৈক্য।

২। প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে যে দল যোগদান করেনি সেটি ছিল–

(ক) কংগ্রেস (খ) মুসলিম লীগ

(গ) হিন্দু মহাসভা (ঘ) লিবারেল দল।

৩। গোলটেবিল বৈঠকসমূহে অস্পৃশ্যদের প্রতিনিধি ছিলেন–

(ক) তেজবাহাদুর সাপ্রুড (খ) এম.আর. জয়াকর

(গ) সম্পূরণ সিং (ঘ) বি.আর. আম্বেদকর।

৪। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস দলের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন–

(ক) মহাত্মা গান্ধী (খ) জওহরলাল নেহরু

(গ) আবুল কালাম আযাদ (ঘ) বল্লভ ভাই প্যাটেল।

৫। গোলটেবিল বৈঠক চলাকালীন সময়ে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন–

(ক) রামজে ম্যাকডোনাল্ড (খ) স্যামুয়েল হোর

(গ) নেভিল চেম্বারলেইন (ঘ) উইন্সটন চার্চিল।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। গোলটেবিল বৈঠক কেন আহ্বান করা হয়েছিল?

২। ভারতীয় ফেডারেশনে যোগদানের ব্যাপারে দেশীয় রাজ্যসমূহের অবস্থান ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। গোলটেবিল বৈঠকে আলোচিত প্রধান সমস্যাগুলো কি ছিল?

২। গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয় কেন?

পাঠ - ৬

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের প্রেক্ষাপট জানতে পারবেন;*
- *আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ জানতে পারবেন;*
- *আইনে ফেডারেশন গঠন সংক্রান্ত বিধানসমূহের অকার্যকারিতার কারণ বলতে পারবেন;*
- *আইনের সার্বিক ফলাফল জানতে পারবেন।*

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে গোলটেবিল বৈঠকের কার্যবিবরণী বিষয়ক একটি শ্বেতপত্র প্রকাশিত হয়। বৃটিশ পার্লামেন্ট এই শ্বেতপত্র অনুমোদন করে এবং ঐ বছরের এপ্রিল মাসে একটি সংসদীয় সিলেক্ট কমিটির ওপর ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির জন্য সুপারিশমালা প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণ করে। উক্ত কমিটি পরবর্তী বছরের শেষদিকে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করে। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে বৃটিশ পার্লামেন্ট একটি আইন প্রণয়ন করে। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৪ এপ্রিল রাজা এই আইনের প্রতি সম্মতি প্রদান করেন। এর নাম 'ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫'। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল থেকে এই আইন কার্যকর হয়।

বৃটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন এক মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এর পশ্চাতে ছিল দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা ও চিন্তা-ভাবনা। যে চারজন এই আইনের প্রধান রচয়িতা ছিলেন তাঁরা হলেন ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর, তাঁর সংসদীয় উপসচিব আর.এ. বাটলার , সংসদীয় সিলেক্ট কমিটির চেয়ারম্যান লর্ড লিনলিথগো (পরবর্তী ভারতীয় ভাইসরয়), এবং এই আইনের প্রধান মুসাবিদাকারী স্যার মরিস গইয়ার (পরে ভারতের প্রধান বিচারপতি)। যদিও ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হয়নি তবুও এর তাৎপর্য অস্বীকার করা যায় না। এর মাধ্যমে বৃটিশ ভারতীয় প্রদেশসমূহ স্বায়ত্তশাসনের স্বাদ পায়। স্বাধীনতা-উত্তর ভারত ও পাকিস্তানের নিজস্ব সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন (কতিপয় সংশোধন সাপেক্ষে) দু'দেশের অস্থায়ী শাসনতন্ত্র হিসেবে কার্যকর ছিল।

এই আইনের সারবস্তু ছিল– (১) বৃটিশ ভারতের এগারটি প্রদেশের জন্য স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন, এবং (২) কেন্দ্রে একটি ভারতীয় ফেডারেশন গঠন যাতে দেশীয় রাজ্যসমূহ যোগদান করবে। কেন্দ্রে এবং প্রদেশসমূহে সংসদীয় সরকারের ব্যবস্থা করা হয়। তবে কেন্দ্রে ভাইসরয়কে এবং প্রদেশে গভর্নরকে কতিপয় বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয় যা সত্যিকার সংসদীয় ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন ছিল।

উক্ত মৌলিক শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করার জন্য তিনটি প্রশাসনিক ও পদ্ধতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের আইনের অংশ হিসেবে। সেগুলো ছিল– (১) বার্মা ও এডেনকে ভারত থেকে আলাদা করা হয়। সিন্ধুকে বোম্বাই থেকে এবং উড়িষ্যাকে বিহার থেকে পৃথক করে উভয়কে গভর্নর-শাসিত প্রদেশের মর্যাদা দেওয়া হয়, (২) প্রধান শক্তি (Paramount power) হিসেবে দেশীয় রাজ্যসমূহের ওপর তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা ভারত সরকারের পরিবর্তে একজন রাজ-প্রতিনিধির (Crown Representative)

ওপর ন্যস্ত করা হয়। তবে ভাইসরয় রাজ-প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। (পরবর্তী বছরগুলোতে ভাইসরয়ই সবসময় উক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন), (৩) নতুন আইন সভাগুলোতে সম্প্রদায় ভিত্তিক পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বলবৎ থাকবে। আসন বন্টনের ভিত্তি ছিল ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে বৃটিশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ (Communal Award)। এই রোয়েদাদ অনুযায়ী প্রায় সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনের অধিকার এবং আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। অস্পৃশ্যদেরকে হিন্দু সম্প্রদায় বহির্ভুত একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রূপে গণ্য করা হয়।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পথ সুগম করার জন্য প্রদেশসমূহে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত দ্বৈত শাসন (Dyarchy) বিলোপ করা হয়। মন্ত্রিগণ প্রদেশের এখতিয়ারভুক্ত সব বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন। গভর্নর কতিপয় ক্ষেত্রে নিরংকুশ ক্ষমতা ভোগ করবেন এবং 'ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনা' কাজে লাগাবেন। এসব বিশেষ ক্ষমতা ও দায়িত্বের মধ্যে ছিল শান্তিরক্ষা, সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা ইত্যাদি। তদুপরি, সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থা ব্যর্থ বা অচল হলে গভর্নর সরাসরি নিজহাতে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারবেন।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের আইনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্প্রসারণের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। ভোটদাতাদের সম্পত্তির যোগ্যতা (Property qualifications) কমানো হয় যাতে ভোটদাতার সংখ্যা আগের চেয়ে পাঁচগুণ বেড়ে যায়। সকল প্রাপ্তবয়স্ককে ভোটাধিকার দিলে ভোটদাতার সংখ্যা যা হতো ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের আইনের মাধ্যমে তার প্রায় এক-চতুর্থাংশ হয়। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের আইন কেন্দ্রে ফেডারেল পদ্ধতির সরকার গঠনের মূলনীতি প্রণয়ন করে। ফেডারেশনের শর্ত ছিল যে, তাতে কমপক্ষে এমন সংখ্যক দেশীয় রাজ্য যোগদান করবে যার মোট জনসংখ্যা সমস্ত দেশীয় রাজ্যের জনসংখ্যার কমপক্ষে অর্ধেক হবে। এই শর্ত পূর্ণ হয়নি। অর্থাৎ যথেষ্ট সংখ্যক দেশীয় রাজ্য ফেডারেশনে যোগদান করেনি বিধায় শেষ পর্যন্ত এই আইনের কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্কিত বিধিসমূহ কার্যে পরিণত হয়নি। যদিও প্রথম গোলটেবিল বৈঠক চলাকালীন সময়ে সর্বভারতীয় ফেডারেশন গঠন সম্ভবপর বলে মনে হয়েছিল। ঐ অধিবেশনে বিকানিরের মহারাজা কিছু শর্তসাপেক্ষে দেশীয় রাজ্যসমূহের পক্ষ থেকে ফেডারেশনে যোগদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশনে তিনি এই মর্মে আশ্বাস দেন যে, রাজন্যবর্গ একটা স্বায়ত্তশাসিত ফেডারেশনে যোগ দেবেন যদি তাঁদের অধিকার নিশ্চিত করা হয়। তার এই বক্তব্যের পক্ষে তিনি ভোপালের নবাবের সমর্থন লাভ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজন্যবর্গের উৎসাহ কমে যায়। একটি সর্বভারতীয় ফেডারেশনের সঙ্গে নিজেদের ভাগ্য জড়ানোর ব্যাপারে তাঁরা নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আক্রান্ত হন।

এই আইন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ফেডারেশন সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজন্যবর্গকে সত্যিকার ভিটো (veto) প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ফেডারেশনে যোগদান করা না করা শাসকদের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে তাঁদের অনিচ্ছার কারণে ফেডারেশনের পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের ফেডারেল অংশের প্রধান ধারাসমূহ ছিল নিম্নরূপ–

কেন্দ্রীয় আইনসভা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হবে– (১) উচ্চকক্ষ– কাউন্সিল অফ স্টেট, এবং (২) নিম্নকক্ষ– হাউস অফ এসেম্বলি। উচ্চকক্ষে বৃটিশ ভারতের সদস্য সংখ্যা হবে ১৫৬ এবং যোগদানকারী (acceding) দেশীয় রাজ্যসমূহ থেকে অনুর্ধ্ব ১০৪জন। নিম্নকক্ষে বৃটিশ ভারত এবং দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি সংখ্যা হবে যথাক্রমে ২৬০ এবং ১২৫। দুই কক্ষেই দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ শাসকগণ কর্তৃক মনোনীত হবেন।

দেশীয় রাজ্যসমূহের জনসংখ্যা ছিল সারা ভারতের জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশেরও কম। কাজেই রাজ্যগুলোকে প্রদত্ত প্রতিনিধি সংখ্যা জনসংখ্যানুপাতের চেয়ে বেশি ছিল। তদুপরি আইনানুসারে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসমূহের ব্যাপারে কেবলমাত্র সেই সমস্ত ক্ষমতা ভোগ করবে যা প্রতিটি দেশীয় রাজ্যের শাসক যোগদানের দলিল (Instrument of Accession) মারফত ছেড়ে দিতে সম্মত হবেন।

এই আইনের শর্তসমূহ শাসকবর্গের এত অনুকূলে থাকা সত্ত্বেও তাঁরা শেষ পর্যন্ত ফেডারেশন গঠনে সম্মত হননি। এর মূল কারণ নিজেদের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে একটা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত হওয়ার ব্যাপারে রাজন্যবর্গের স্বাভাবিক অনীহা ছিল। ফলে, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের আইনের ফেডারেশন গঠন সংক্রান্ত বিধিসমূহ অকার্যকর থেকে যায়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে বৃটিশ ভারতের দ্বিধা-বিভক্তি ও স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯১৯ খ্রি. প্রণীত আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। ১৯৩৬ খ্রি. থেকে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু পর্যন্ত নতুন ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো ফেডারেশন গঠনে রাজন্যবর্গের সহযোগিতা লাভের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের আইনের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত ধারাসমূহ কার্যকর হয়েছিল। অবশ্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় দল এই আইনের বিরোধী ছিল। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে দলের লখ্‌নৌ অধিবেশনে সভাপতি জওহরলাল নেহরু এই আইন সম্পর্কে কঠোর মত প্রকাশ করে বলেন যে, এর প্রতি কংগ্রেসের নীতি হবে আপোষহীন বিরোধিতা এবং সেই সঙ্গে একে নস্যাৎ করার অবিরাম প্রচেষ্টা। এই আইনে কংগ্রেসের দাবি 'পূর্ণ স্বরাজ' স্বীকৃত হয়নি, এমনকি ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্যাদাও দেওয়া হয়নি। তদুপরি মুসলমানসহ প্রায় সব সংখ্যালঘুর জন্য পৃথক নির্বাচনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসবই ছিল এই আইনের প্রতি কংগ্রেসের বিরূপতার প্রধান কারণ। আইন অকার্যকর করার ঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়ে কংগ্রেস ১৯৩৬–৩৭ খ্রি. উক্ত আইনের আওতায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।

মুসলিম লীগও এই আইনের সমালোচনায় মুখর ছিল। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে লীগের বোম্বাই অধিবেশনে একে অগণতান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে প্রস্তাব নেওয়া হয়। লীগ সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ভাষায় এই আইন ছিল এক 'দানবিক ব্যবস্থা' (monstrosity)। তথাপি লীগের উক্ত সভায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বিষয়ক বিধিসমূহ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আইনের ফেডারেল অংশ কার্যকরী হলে কেন্দ্রে হিন্দু আধিপত্য কায়েম হবে এটাই ছিল লীগ কর্তৃক বিরোধিতার মূল কারণ।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের আইনানুসারে ১৯৩৬–৩৭ খ্রিস্টাব্দের শীতকালে প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ছোটবড় প্রায় সব দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এই প্রাদেশিক নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্য এবং মুসলিম লীগের ব্যর্থতা প্রকট হয়। কংগ্রেস বৃটিশ ভারতের এগারটি প্রদেশের মধ্যে আটটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং সরকার গঠন করতে সমর্থ হয়। লীগ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে (বাংলা ও পাঞ্জাব) সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আসন লাভে ব্যর্থ হয়। অবশ্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে মুসলিম লীগ এই ব্যর্থতা পুষিয়ে নিতে সক্ষম হয়। কংগ্রেস শাসনাধীন প্রদেশসমূহে ধীরে ধীরে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কংগ্রেস বিরোধী এবং লীগপন্থী মনোভাব জোরদার হয়। মুসলিম লীগ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সর্বভারতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের প্রধান রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়। ফলে ভারতের রাজনীতিতে দ্রুত সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ঘটে।

সারসংক্ষেপ

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন পূর্ববর্তী কয়েক বছরের শাসনতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনা ও কার্যক্রমের ফল। এই আইন বৃটিশ ভারতের সাংবিধানিক বিবর্তনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন এবং সর্বভারতীয় ফেডারেশন গঠনের বিধান। তবে দেশীয় রাজ্যের শাসকদের অনিচ্ছাহেতু ফেডারেশন সংক্রান্ত ধারাসমূহ কার্যকর হয়নি। আইনের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বিষয়ক বিধি-বিধান কার্যকর হয়েছিল। এই আইনের বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ১৯৩৬-৩৭ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্য ও মুসলিম লীগের ব্যর্থতা প্রকট হয়। এগারটি প্রদেশের মধ্যে আটটিতে কংগ্রেস দলীয় সরকার গঠিত হয়। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব বিস্তার লাভ করে। এই সুযোগে মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের প্রধান রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়। ফলে রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ত্বরান্বিত হয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১. S.M. Burke and Salim Al-Din Quraishi, *The British Raj in India: An Historical Review*, Dhaka, 1995.
২. H.V. Hodson, *The Great Divide: Britain-India-Pakistan,* Karachi, 1969.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ-এর মূলকথা ছিল–
(ক) যৌথ নির্বাচন (খ) পৃথক নির্বাচন
(ঘ) পরোক্ষ নির্বাচন (ঘ) কোনটিই নয়।

২। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল–
(ক) ফেডারেশন গঠন (খ) কনফেডারেশন গঠন
(গ) ডোমিনিয়ন মর্যাদা প্রদান (ঘ) পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান।

৩। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের আইনের ফলে ভোটদাতার সংখ্যা–
(ক) বৃদ্ধি পায় (খ) হ্রাস পায়
(গ) একই থাকে (ঘ) কোনটিই নয়।

৪। দেশীয় রাজ্যসমূহের জনসংখ্যা সারা ভারতের জনসংখ্যার কত অংশ ছিল?
(ক) অর্ধেক (খ) এক-তৃতীয়াংশের বেশি
(গ) এক-চতুর্থাংশের কম (ঘ) এক-পঞ্চমাংশের কম।

৫। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের আইন–
(ক) সম্পূর্ণ কার্যকর হয় (খ) সম্পূর্ণ অকার্যকর হয়
(গ) ফেডারেশন সংক্রান্ত অংশ কার্যকর হয় (ঘ) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বিষয়ক অংশ কার্যকর হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের পটভূমি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
২। এই আইনের প্রতি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মনোভাব কি ছিল?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যালোচনা করুন।
২। এই আইনের সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল্যায়ন করুন।

পাঠ - ৭

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও ভারতবর্ষের বিভক্তি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সামাজিক ঐতিহাসিক ভিত্তি সম্পর্কে জানবেন;*
- *হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সম্পর্কে জানবেন;*
- *বৃটিশ কর্তৃপক্ষের 'ভাগ কর এবং শাসন কর নীতি' সম্পর্কে জানবেন;*
- *জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নীতি সম্পর্কে জানবেন।*

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হয়। এ ছিল দ্বিধাবিভক্ত জাতীয়তাবাদ তথা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির চূড়ান্ত পরিণতি। এই বিভাজনের মূল নিহিত ছিল সম্প্রদায় ভিত্তিক চিন্তা-চেতনার মধ্যে যা প্রথম থেকেই জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে আচ্ছন্ন করেছিল। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান দুই প্রধান সম্প্রদায়ের ওপর বৃটিশ শাসনের অভিঘাত ছিল ভিন্নতর। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুগণ সহজে নতুন শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে নিজেদের জাগতিক উন্নয়নে সচেষ্ট হয়। এক্ষেত্রে মুসলিম সম্প্রদায়ের ব্যর্থতার জন্য তারা সব বৈষয়িক ব্যাপারে হিন্দুদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় ভারতীয়দের সামনে যতটুকু উন্নতির সম্ভাবনা ছিল তার চাবিকাঠি ছিল এই নতুন প্রচলিত শিক্ষা। হিন্দু সম্প্রদায়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এই শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে আত্মোন্নতিতে সক্ষম হয়। নানা কারণে মুসলিম সম্প্রদায় এই শিক্ষা গ্রহণে যুগপৎ অনিচ্ছুক ও অপারগ হওয়াতে তাদের উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়। শিক্ষার ব্যাপারে মুসলমানগণ নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকার ফলে শেষ পর্যন্ত সম্প্রদায় হিসেবে তারা হিন্দুদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ, উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষকালে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান বিদ্যমান ছিল, যা তাদের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ, সন্দেহ ও বিভেদের বীজ বপন করে। রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যবাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত এভাবেই তৈরি হয়। এই সম্প্রদায় ভিত্তিক বিভেদ বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের 'ভাগ কর এবং শাসন কর' নীতির সহায়ক হয়।

উনিশ শতকের শেষ দিকে যখন বৃটিশ সরকার কিছু কিছু সংস্কারের মাধ্যমে ভারতে প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয় তখন মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু আধিপত্যের ভীতি দেখা দেয়; কারণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনই স্বাভাবিক। তখনকার ভারতবর্ষে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক আনুগত্যের বাইরে অন্য কোন কিছু রাজনীতিতে ক্রিয়াশীল হবে তা বোধগম্য হয়নি। মুসলমানদের ভীতি খুব অমূলক ছিল বলে মনে হয় না। অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনার ভিত্তি ছিল খুবই দুর্বল ছিল। বৈষয়িক সাফল্য হিন্দুদের মধ্যে একপ্রকার শ্রেয়বোধের জন্ম দেয় যা মুসলিম সম্প্রদায়ের ভীতি ও স্বাতন্ত্র্যবোধকে আরো বাড়িয়ে তোলে।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উনিশ শতকের মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের পরিবর্তে স্বীয় সম্প্রদায়ের জাগরণের প্রচেষ্টাই অধিক লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত, হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কার্যাবলিতে এই ধারণাই প্রতিষ্ঠিত হয় যে ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণা তেমন শক্তিশালী ছিল না। ১৮৮৫ খ্রি. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হওয়ার পর দেখা যায় যে এই সংগঠনে মুসলমানদের উপস্থিতি ছিল নগন্য। যদিও কিছু মুসলমান প্রথম থেকে কংগ্রেস পার্টিতে নেতৃত্বের পদে আসীন ছিলেন, তথাপি ব্যাপকহারে মুসলমানদের সমর্থন লাভে এই সংগঠন শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। অসাম্প্রদায়িক ও সর্বভারতীয় জাতীয়তার দাবিদার হিসেবে কংগ্রেসের এই ব্যর্থতা সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকেই শক্তিশালী করে।

বিশ শতকের শুরুতে বৃটিশ ভারতীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত কতিপয় সিদ্ধান্ত সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়। এ প্রসঙ্গে ১৯০৫ খ্রি. ভাইসরয় লর্ড কার্জনের বঙ্গবিভাগ উল্লেখযোগ্য। এর প্রতিক্রিয়া সারা ভারতে বিস্তার লাভ করে এবং রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলিম সমস্যাকে আরো জটিল করে তোলে। যদিও সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী শুধুমাত্র প্রশাসনিক সুবিধার্থে সুবৃহৎ বাংলা প্রদেশকে দুই ভাগ করা হয়, বঙ্গ বিভাগ বিরোধী উদীয়মান জাতীয়তাবাদী শক্তি একে 'ভাগ কর এবং শাসন কর' নীতির বহিপ্রকাশ হিসেবে দেখে। কার্জনের কিছু বক্তব্যের মধ্যেও এই ভেদনীতির সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯০৪ খ্রি. ফেব্রুয়ারি মাসে লর্ড কার্জন ঢাকায় প্রদত্ত এক ভাষণে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের নিকট এমন এক সম্ভাবনা তুলে ধরেন যা পূর্বেকার দিনের মুসলমান রাজা-বাদশাহদের আমলে বিদ্যমান ছিল। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ, পশ্চাৎপদ পূর্ব বাংলার মানুষের সম্মুখে লর্ড কার্জন এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্র তুলে ধরেন। ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহর সক্রিয় সমর্থনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে পরিকল্পিত বঙ্গবিভাগের পক্ষে জনমত সংগঠিত হতে থাকে। অপরদিকে কলিকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণী এর ঘোরতর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। বঙ্গ বিভাগের বিপক্ষেও সাম্প্রদায়িক এবং শ্রেণী স্বার্থের উপাদান নিহিত ছিল। পূর্ব বাংলা ও আসাম নিয়ে গঠিত নতুন প্রদেশ কলিকাতা কেন্দ্রিক পেশাজীবী, কল-কারখানার মালিক, ভূ-স্বামী ইত্যাদির শ্রেণীস্বার্থকে বিঘ্নিত করবে এটা সহজেই অনুমেয় ছিল। এ ধরনের বেশির ভাগ মানুষ হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল। সুতরাং বঙ্গ বিভাগের পশ্চাতে কার্জনের আসল উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন এর ফলে বাংলা তথা ভারতীয় রাজনীতিতে বিদ্যমান সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি আরো ব্যাপকতর হয়।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জন্মের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রাতিষ্ঠানিকরূপ লাভ করে। মুসলিম লীগের দাবি অনুসারে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইনের মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথার বন্দোবস্ত করা হয়। নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগই ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রধান রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়। মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা এবং মুসলমানদের ওপর এর ক্রমবর্ধমান প্রভাব ছিল কংগ্রেসের দাবির প্রতি এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। দুই দলের মধ্যে কোন কোন সময় সহযোগিতার ভাব লক্ষ্য করা গেলেও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল মূলত বৈরীভাবাপন্ন। শেষ পর্যন্ত এই সম্পর্ক প্রবল শত্রুতায় পর্যবসিত হয় এবং ভারতবর্ষের দ্বিধাবিভক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সৃষ্টিতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই দাঙ্গা ছিল একাধারে সাম্প্রদায়িকতার কারণ ও ফলস্বরূপ। বিশ শতকের প্রারম্ভিক বছরগুলোতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। নানা রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে সৃষ্ট পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং অসহিষ্ণুতাই এই সমস্ত দাঙ্গার প্রধান কারণ ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয় রাজনৈতিক দলের বা ব্যক্তির উস্কানিমূলক কার্যকলাপ। ১৯২০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ব্যাপক হারে সংঘটিত

হতে থাকে। খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের পরবর্তী বছরগুলোতে এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের যে পরিবেশ তৈরি হয়েছিল তা নষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য আন্দোলন চলাকালীন সময়েই মালাবারে মোপলা বিদ্রোহ (১৯২১খ্রি.) ঘটে এবং বোম্বাইসহ বিভিন্ন পশ্চিম ভারতীয় শহরে ও গ্রামাঞ্চলে দাঙ্গা শুরু হয়। দরিদ্র ও অশিক্ষিত মোপলা মুসলমানগণ তাদের চেয়ে উন্নত হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহ দ্রুত হিন্দু-মুসলিম খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আধিক্যের জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল। ১৯২৪ খ্রি. দিল্লি, লাখ্‌নৌ, এলাহাবাদসহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন শহরে দাঙ্গা সংঘটিত হয়। ১৯২৫ খ্রি. কমপক্ষে তেরটি দাঙ্গা সংঘটিত হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রসঙ্গে অস্পৃশ্যদের নেতা বি.আর.আম্বেদকরের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। ১৯২০-৪০ সময়কালে সংঘটিত দাঙ্গা পর্যালোচনাপূর্বক তিনি মন্তব্য করেন, "একথা বলা অতিরঞ্জিত হবেনা যে এ ছিল ভারতের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিশ বছরের গৃহযুদ্ধের এক রেকর্ড; এর মধ্যে কখনও কখনও স্বল্প সময়ের জন্য সশস্ত্র শান্তি বিরাজ করতো।"

১৯২০-এর দশকের শেষ পর্যায়ে সব দলমত ও সম্প্রদায় কর্তৃক গ্রহণযোগ্য একটা সাংবিধানিক কাঠামো নির্মাণের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু দুই প্রধান দল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মতানৈক্যের ফলে এই সমস্ত উদ্যোগ অকৃতকার্য হয়ে যায়। এর ফলে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ভারতীয় রাজনীতির প্রধান নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হয়। এই প্রসঙ্গে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত বিধিসমূহের বাস্তবায়নের বিষয় লক্ষনীয়। ১৯৩৬-৩৭ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফল অনুসারে কংগ্রেস আটটি প্রদেশে সরকার গঠন করে এবং ১৯৩৯ খ্রি. অক্টোবর পর্যন্ত দুই বছরের অধিক সময় ঐসব প্রদেশে কংগ্রেস শাসন বলবৎ থাকে। এই সময়ে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আরো বিস্তার লাভ করে এবং ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারতের সম্ভাবনা বিলীন হয়ে যায়। কংগ্রেস শাসনের প্রতি মুসলমানদের বিরূপতার সুযোগে জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ সংগঠিত হয় এবং কংগ্রেস শাসিত প্রদেশসমূহে মুসলিম নির্যাতনের অভিযোগ উত্থাপন করে। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে লীগের লক্ষৌ অধিবেশনে জিন্নাহ অভিযোগ করেন যে কংগ্রেস "হিন্দু-নীতি" (Hindu Policy) অনুসরণ করছে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক হয়ে সাম্প্রদায়িক বিরোধের উস্কানি দিচ্ছে। এ ছিল কংগ্রেসের নিজস্ব অস্ত্র দিয়ে তাকেই ঘায়েল করার চেষ্টা, এতদিন পর্যন্ত এ জাতীয় অভিযোগ কংগ্রেসই লীগের বিরুদ্ধে আনয়ন করত। এইচ.ভি. হডসন তাঁর The Great Divide নামক পুস্তকে জিন্নাহর এই উক্তিকে 'a remarkable case of stealing one's opponent's clothes' বলে অভিহিত করেছেন।

এই পর্যায়ে জিন্নাহর বক্তব্যের মূলকথা ছিল এই যে কংগ্রেস শাসনাধীন মুসলমানগণ সুবিচার ও ন্যায়নীতি (justice and fairplay) আশা করতে পারেনা। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দলের পাটনা সম্মেলনে তিনি ঘোষণা করেন যে 'কংগ্রেসী ফ্যাসিবাদ'-এর কারণে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। এই সময় কংগ্রেস শাসিত প্রদেশসমূহে মুসলমানদের ওপর নির্যাতন সংক্রান্ত রিপোর্ট (পীরপুর রিপোর্ট) প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টের প্রণেতা ছিল মুসলিম লীগ কাউন্সিল কর্তৃক নিয়োজিত কমিটি। একই বিষয়ের ওপর পরবর্তী বছরের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয় শরীক রিপোর্ট যার রচয়িতা ছিল বিহার মুসলিম লীগ। পীরপুর রিপোর্টের নিম্নোক্ত বক্তব্যের মধ্যে তৎকালীন রাজনীতিতে প্রবল সাম্প্রদায়িক চেতনা এবং সংখ্যালঘু মুসলমান জনগণের ভীতি মূর্ত হয়েছে:

The conduct of the Congress Governments seems to substantiate the theory that there is something like identity of purpose between Congress and the Hindu Mahasabha... We Muslims feel that, not withstanding the non-communal professions of Congress and the desire of a few Congressmen to follow a truly national policy, a vast majority

of the Congress members are Hindus who look forward, after many centuries of British and Muslim rule, to the re-establishment of a purely Hindu Raj. (কংগ্রেস সরকারগুলোর আচরণ এই তত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করছে বলে মনে হয় যে, কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্য অভিন্ন। ...আমরা মুসলমানগণ মনে করি যে, কংগ্রেসের অসাম্প্রদায়িক বক্তব্য ও সত্যিকার জাতীয় নীতি অনুসরণে উক্ত দলের স্বল্প সংখ্যক সদস্যের আগ্রহ সত্ত্বেও কংগ্রেস সদস্যবৃন্দের একটা বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হিন্দু, যারা বৃটিশ ও মুসলিম শাসনের অনেকগুলো শতাব্দী পর বিশুদ্ধ হিন্দু রাজ পুন:প্রতিষ্ঠার দিকে তাকিয়ে আছে।)

একথা সত্য যে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীতি উদ্রেককারী কার্যকলাপ কংগ্রেস শাসিত প্রদশেসমূহে সংঘটিত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো উর্দুকে অবহেলা এবং হিন্দীর পৃষ্ঠপোষকতা, প্রশাসন কর্তৃক হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, সরকারি চাকরিলাভের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিতকরণ ইত্যাদি। আরো ছিল "বন্দে মাতরম"কে জাতীয় সংগীতের মর্যাদা প্রদান, কংগ্রেসের দলীয় পতাকাকে জাতীয় পতাকার ন্যায় ব্যবহার এবং "ওয়ার্ধা স্কীম" তথা কংগ্রেস-প্রণীত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন যার মূল কথা ছিল অহিংসা, চরকায় কাপড় বয়ন এবং ধর্মীয় শিক্ষা বর্জন। মুসলমানগণ এ ধরনের কার্যকলাপ মনেপ্রাণে গ্রহণ করেনি। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, কংগ্রেস শাসনের দুই বছরাধিক সময়ে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত-বিভাগ তথা পাকিস্তান আন্দোলন বিপুল শক্তি সঞ্চয় করে। এই সময়ে মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হিসেবে স্বীয় দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় এবং একটা মুসলিম গণসংগঠনে পরিণত হয়।

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভারতকে বৃটিশ যুদ্ধ প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত করা হয় ভারতীয় মতামতের তোয়াক্কা না করেই। এজন্য কংগ্রেস ভারতীয় সরকারের সমালোচনায় লিপ্ত হয়– যদিও দলের ওয়ার্কিং কমিটি ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করে। মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটিও জার্মান আগ্রাসন-বিরোধী যুদ্ধকে নীতিগতভাবে সমর্থন জানায়। তবে লীগের ওয়ার্কিং কমিটি ভারত সরকারকে এই মর্মে সাবধান করে যে, মুসলমানদের অটুট সমর্থন কেবল দু'টি শর্তসাপেক্ষে দেওয়া হবে–

(১) কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলোতে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি সুবিচার ও ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠা;

(২) মুসলমানদের প্রতি সরকারের এইমর্মে আশ্বাস যে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সম্মতি ব্যতীত কোন ভবিষ্যত শাসনতান্ত্রিক কাঠামো নির্মাণ বা সে সম্পর্কে কোন ঘোষণা দেওয়া হবে না। সংক্ষেপে যুদ্ধারম্ভের পটভূমিতে যথাশীঘ্রই সম্ভব ক্ষমতার হস্তান্তর ছিল কংগ্রেসের দাবি; অন্যদিকে যে কোন শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে ভিটো দেওয়ার এখতিয়ার ছিল মুসলিম লীগের দাবি। এর ফলে বৃটিশ ভারতীয় সরকার, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে যে ত্রি-পক্ষীয় টানাপোড়েন শুরু হয় তা শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভাজনের মধ্যে পরিণতি লাভ করে।

অতপর মুসলিম লীগ নেতা জিন্নাহ ভারতীয় মুসলমানদেরকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং তাদের জন্য পৃথক আবাসভূমির দাবিও জোরদার হয়। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে জিন্নাহ ঘোষণা করেন যে, যে কোন সাংবিধানিক ব্যবস্থায় এটা স্বীকৃত হতেই হবে যে ভারত এক জাতি নয় বরং দুই জাতির দেশ। মুসলমানগণ কোন পক্ষের চাপিয়ে নেওয়া বন্দোবস্ত গ্রহণ করবে না এবং নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই নির্ধারণ করবে। ঐ বছরের মার্চ মাসের ২৩ তারিখে বিখ্যাত 'লাহোর প্রস্তাব' গৃহীত হয় লীগের লাহোর অধিবেশনে। এই প্রস্তাবের মূলকথা ছিল ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বে অবস্থিত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র (Seperate states) গঠন। প্রস্তাবে পাকিস্তান শব্দটির উল্লেখ

ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে মূলত কংগ্রেস প্রভাবিত সংবাদপত্রসমূহের সমালোচনামূলক লেখায় এটি 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসেবে উল্লেখ হতে থাকে।

পরবর্তী বছরগুলোতে ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং সাংবিধানিক প্রশ্নে অনেক ত্রিপক্ষীয় আলাপ-আলোচনা চলে। এসবের উদ্যোক্তা ছিল বৃটিশ কর্তৃপক্ষ। ক্রিপস মিশন (১৯৪২ খ্রি.), সিমলা সম্মেলন (১৯৪৫ খ্রি.) এবং সর্বশেষে ক্যাবিনেট মিশন (১৯৪৬ খ্রি.) এই সমস্ত বৃটিশ উদ্যোগের ফল। একটা দুর্বল কেন্দ্র এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ভারতকে স্বাধীনতা প্রদান করা ছিল সম্ভবত বৃটিশ প্রচেষ্টাসমূহের লক্ষ্য। কিন্তু সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ততদিনে এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যে কোন আপোস ফর্মুলা দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের নিকট একই সঙ্গে গ্রহণযোগ্য হয়নি। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে গান্ধী-জিন্নাহ্‌র মধ্যকার সরাসরি আলোচনাও ব্যর্থ হয়ে যায়। ঘন ঘন রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং বিশৃঙ্খলা রাজনৈতিক ব্যর্থতার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে দেখা দেয়। এই প্রসঙ্গে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট কলিকাতায় সংঘটিত ভয়াবহ হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা উলে-খযোগ্য যা ইতিহাসে The Great Calcutta Killing নামে খ্যাত হয়েছে। এই অবস্থায় বৃটিশ সরকার প্রয়োজনে ভারত বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এডমিরাল লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ক্ষমতা হস্তান্তরের দায়িত্ব অর্পণ করে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে শেষ ভাইসরয় নিয়োগ করা হয়।সমস্ত দল ও মতের ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার পর মাউন্টব্যাটেন ভারত বিভাগের সিদ্ধান্ত নেন এবং ৩ জুন তাঁর পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। সেই বিভাজন-পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। ভারতবর্ষের দ্বিধাবিভক্তি সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অবশ্যম্ভাবী ফল এবং এর জন্য সংশ্লিষ্ট সবাই দায়ী।

সারসংক্ষেপ

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে বৃটিশ ভারত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের আবির্ভাব হয়। এই বিভাজন ছিল হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অনিবার্য পরিণতি। ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষকালেই সাম্প্রদায়িক ভাবধারা লক্ষ্য করা যায়। দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যকার সার্বিক অসমতা তাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় জাতীয়তাবোধ জাগরণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। সংখ্যালঘু মুসলমান সংখ্যাগুরু হিন্দু কর্তৃক শাসিত ও শোষিত হওয়ার ভয় করতো। এই ভীতি পুরোপুরি অমূলক ছিল না, কারণ ধর্মীয় আনুগত্যই ছিল সর্বাপেক্ষা প্রবল। ১৯৩৭–৩৯ খ্রি. বৃটিশ ভারতের আট প্রদেশে কংগ্রেস শাসনের সময় মুসলিম ভীতি আরো ঘনীভূত হয়। ফলে মুসলিম লীগের দ্বিজাতিতত্ত্বের ধারণা ও স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবি জোরদার হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমে এই দাবি পূর্ণতা লাভ করে। রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সৃষ্টির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলেই দায়ী ছিল।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১. S.M. Burke and Salim Al-Din Quraishi, *The British Raj in India: An Historical Review*. Dhaka, 1995.
২. H.V. Hodson, *The Great Divide: Britain-India-Pakistan,* Karachi, 1969.
৩. Sumit Sarkar, *Modern India, 1885-1947*, Delhi, 1983.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ভারতে ইংরেজি শিক্ষা চালু হয়–
(ক) সপ্তদশ শতাব্দীতে (খ) অষ্টাদশ শতাব্দীতে
(গ) উনবিংশ শতাব্দীতে (ঘ) বিংশ শতাব্দীতে।

২। মুসলমানগণ শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায়–
(ক) পিছিয়ে ছিল (খ) এগিয়ে ছিল
(গ) সমান অবস্থায় ছিল (ঘ) কোনটিই সঠিক নয়।

৩। উনিশ শতকের রাজনীতিতে অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ ছিল–
(ক) সবল (খ) দুর্বল
(গ) একেবারে অনুপস্থিত (ঘ) একমাত্র বৈশিষ্ট্য।

৪। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় কোন খ্রিস্টাব্দে?
(ক) ১৮৯০ (খ) ১৯০৬
(গ) ১৯১৩ (ঘ) ১৯৩০।

৫। ভারতবর্ষের দ্বিধাবিভক্তির জন্য দায়ী ছিল–
(ক) কংগ্রেস (খ) মুসলিম লীগ
(গ) বৃটিশ সরকার (ঘ) সবাই।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। ভারতীয় জাতীয়তাবাদে সাম্প্রদায়িক ভাবধারার উন্মেষ হয় কেন?

২। দ্বিজাতিতত্ত্বের মূলকথা ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের লাহোর প্রস্তাবের প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

২। ১৯৪৭ খ্রি. ভারতবর্ষের বিভাজনের কারণগুলো আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ

পাঠ-১ ঃ ১। (খ); ২। (গ); ৩। (ক); ৪। (ক); ৫। (খ)।
পাঠ-২ ঃ ১। (ক); ২। (ক); ৩। (গ); ৪। (খ); ৫। (গ)।
পাঠ-৩ ঃ ১। (গ); ২। (গ); ৩। (খ); ৪। (ক); ৫। (গ)।
পাঠ-৪ ঃ ১। (গ); ২। (খ); ৩। (খ); ৪। (ক); ৫। (ক)
পাঠ-৫ ঃ ১। (ঘ); ২। (ক); ৩। (ঘ); ৪। (ক); ৫। (ক)।
পাঠ-৬ ঃ ১। (খ); ২। (ক); ৩। (ক); ৪। (গ); ৫। (ঘ)।
পাঠ-৭ ঃ ১। (গ); ২। (ক); ৩। (খ); ৪। (খ); ৫। (ঘ)।